Banglapdf.net
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট
ও
ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর
কর্নেল শাফায়াত জামিল, (অব.)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কিংবদন্তিসম
খ্যাতি-অর্জনকারী বীরযোদ্ধা শাফায়াত জামিল,
লড়াইয়ের ময়দানে অকুতোভয় যে-মানুষটি
বাস্তবজীবনে পরম মিতবাক ও নিভৃতচারী। তদুপরি
স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ষড়যন্ত্রকারীদের পুনরুত্থান,
বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং নভেম্বরের প্রতিবিপ্লবী
চক্রান্তে চার জাতীয় নেতা ও অগ্রণী মুক্তিযোদ্ধাদের
হত্যায় ব্যথিতচিত্তে তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন
আরো বেশি। অথচ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে
সূচনাকালে তাঁর নেতৃত্বেই ঘটেছিল বেঙ্গল রেজিমেন্টের
প্রায় পাঁচশ' সৈনিকের বিদ্রোহ, প্রাথমিক প্রতিরোধের
সেটা ছিল গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এরপর রংপুর
সিলেটের বিভিন্ন রণাঙ্গনে শত্রুর ত্রাস হয়ে বহু
অপারেশনে নেতৃত্ব দিয়েছেন শাফায়াত জামিল,
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করে স্বদেশের মুক্তির জন্য যে
মরণখেলায় মেতেছিলেন তার শেষ পর্যায়ে গুরুতরভাবে
আহত হয়েছিলেন তিনি। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগী
মনোভাব দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন
অগণিত সহযোদ্ধাদের এবং হয়ে উঠেছেন একাত্তরের
বাঙালির বীরগাথার অন্যতম রূপকার। দীর্ঘ পঁচিশ বছর
পর তিনি বাঙ্ময় হয়ে বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের কথা, তরুণ
সাংবাদিক সুমন কায়সারের সহযোগে তিনি মেলে
ধরেছেন রণাঙ্গনের অগ্নিঝরা স্মৃতি। সেই সঙ্গে যোগ
করেছেন পঁচাত্তরের নির্মম নিষ্ঠুর হত্যালীলার বিবরণ,
যে-ঘটনাধারা অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন
তিনি। সব মিলিয়ে শাফায়াত জামিলের গ্রন্থ
হয়ে উঠেছে আমাদের ইতিহাসের অনন্য
ও অপরিহার্য সংযোজন।

ISBN-984-465-144-

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ
রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

কর্নেল শাফায়াত জামিল, অব.

সুমন কায়সার-এর সহযোগিতায় প্রণীত

সাহিত্য প্রকাশ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট
ও
ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

কর্নেল শাফায়াত জামিল, (অব.)

প্রচ্ছদ-শিল্পী : অশোক কর্মকার
তৃতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৪১৫, মার্চ ২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০
প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪০৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
ISBN 984-465-144-1

মূল্য : একশত ষাট টাকা

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০
মুদ্রক : কমলা প্রিন্টার্স, ৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

আমার পূর্বপুরুষ ও
উত্তরাধিকারীদের

লে খ কে র ক থা

আমাদের জীবনের এক অসাধারণ সময় ছিল ১৯৭১। আমাদের লড়াইয়ের বছর, বিজয়ের বছর। আমাদের অহঙ্কারের বছর। বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে নতুন অস্তিত্ব অর্জনের বছর। সেই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতে পেরে ভালো লেগেছে আমার। এ ভালোলাগা প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি, মুক্তিযুদ্ধকে যাদের কাছে বহুদূরের অস্পষ্ট একটি বিষয় করে রাখা হয়েছে, সেই প্রজন্মকে বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সময়টির সঙ্গে পরিচিত করানোর প্রচেষ্টার আনন্দ এটি।

সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় জীবনবাজি রেখে এবং ফাঁসির রশি গলায় পরার ঝুঁকি নিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ২৭ মার্চ সকালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গোটা বাংলাদেশ। অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিটি বাঙালি হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিটি ঘর সত্যিই পরিণত হয়েছিল দুর্ভেদ্য দুর্গে। নয় মাস পর রক্তের সাগরের ওপারে উঁকি দেয় বিজয়ের সূর্য।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে যথেষ্টসংখ্যক না হলেও নেহায়েত কম বই লেখা হয় নি। বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন মানের। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ও ১৪ খণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকাশ করেছে। সেই বিশাল ইতিহাস রচনা ও সঙ্কলনের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা অনেক মুক্তিযোদ্ধারই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বা তাঁদের লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু খেদের সঙ্গে বলতে হয়, আমার সঙ্গে ঐ গ্রন্থের ব্যাপারে একটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি কেউ। কেন জানি না। অথচ ২৫ থেকে ২৭ মার্চ দেশে কী হয়েছে, হচ্ছে, তা নিয়ে যখন সারা দেশে বিপুল উৎকণ্ঠা, জাতির সেই ক্রান্তি লগ্নে, দিক নির্দেশনাহীন দিশেহারা অসহায় জাতির পক্ষে সেই সময় পুরো ৫০০ সৈন্যের একটি ব্যাটালিয়ন নিয়ে আমি যোগ দিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে। '৭১-এ এটাই ছিল সবচেয়ে বিশাল নিয়মিত বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যোগদানের ঘটনা।

সার্টিফিকেটধারী কিছু ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক গ্লানির কারণ। নিজের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর তিন/চার আগে একটি সংগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পুরস্কৃত করে। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা জনৈক কর্নেল জামিলের নামও ছিল। কিন্তু পরে শুনেছি, 'কর্নেল

জামিল' পরিচয়ে কেউ একজন সেই পুরস্কারটি নিয়েও গেছে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি গ্রন্থে রয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বর্বর হত্যাকাণ্ড, ৩ নভেম্বরের কুখ্যাত জেলহত্যা এবং ৭ নভেম্বরের তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের সময় আমার অভিজ্ঞতা। এসব ঘটনা কাছ থেকে যেভাবে দেখেছি তারই যথাসাধ্য বর্ণনা প্রদানের চেষ্টা করেছি। আমার বিবরণ রহস্যাবৃত এই সব ঘটনা সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি দূর করতে পারলে খুশি হবো।

আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি রচনাই বহুল প্রচারিত দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ভোরের কাগজ-এর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমানের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতেই হয়, তাঁর অনুপ্রেরণা ও পুনঃ পুনঃ তাগাদাতেই আমার মতো নীরবতাপ্রিয় লোককে সরব হতে হয়েছে। ভোরের কাগজ-এর তরুণ সাংবাদিক সুমন কায়সার উৎসাহের সঙ্গে আমাকে সহায়তা করেছে। আমি যেভাবে যে-কথাটা বলতে চেয়েছি ঠিক সেভাবেই তুলে আনার জন্য তার প্রচেষ্টা ছিল আন্তরিক। আমি কৃতজ্ঞ সহধর্মিনী রাশিদা শাফায়াতের প্রতি, যিনি সার্বক্ষণিক উৎসাহদানের পাশাপাশি অনেক জরুরি তথ্য মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কয়েকটি ছবি নেয়া হয়েছে নূরুন্নবী খান প্রণীত 'জীবনের যুদ্ধ : যুদ্ধের জীবন' গ্রন্থ থেকে, সেজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কয়েকটি ঘটনা নেয়া হয়েছে মেজর আখতার প্রণীত 'বারবার ফিরে যাই' গ্রন্থ থেকে। সেজন্য তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাই। সাহিত্য প্রকাশ-এর পরিচালক বিশিষ্ট প্রকাশক মফিদুল হককেও বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমার প্রথম বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ার জন্য।

যাঁদের জন্য এই বই লেখা সেই পাঠক সমাজের দ্বারা বইটি আদৃত হলেই আমার এবং সংশ্লিষ্টদের শ্রম সার্থক হবে।

কর্নেল শাফায়াত জামিল, অব.

সূ চি প ত্র

বিদ্রোহ

সত্তরের নির্বাচন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন

১৯৭০-এর এপ্রিলে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে পোস্টিং হয় আমার। ব্যাটালিয়ন তখন লাহোরে অবস্থান করছিল। এক মাসের মধ্যে মেজর র‍্যাঙ্কে উন্নীত করা হয় আমাকে। যে মাসে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে আসে। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব দিয়ে একটা কোম্পানিসহ সিলেটের হবিগঞ্জে পাঠানো হলো আমাকে। নির্বাচন যথারীতি হয়ে গেলো। ফলাফল, আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়। অথচ তারপরও পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিতে চাইলো না পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের জনগণ স্বাধিকারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠায় পরিস্থিতি ক্রমশই চরম অবনতির দিকে যেতে থাকে। ছয় দফা এগারো দফার আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বাঙালির মুকুটহীন সম্রাট। সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

১ মার্চ আমাকে এবং পাঞ্জাবি অফিসার মেজর সাদেক নওয়াজকে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার অজুহাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজ নিজ Battle location-এ গিয়ে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বলছিল, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ অনিবার্য। কাজেই এই প্রস্তুতি। এটা ছিল পাকিস্তানিদের সুপরিকল্পিত তৎপরতার অংশমাত্র। বেশিসংখ্যক বাঙালি সৈন্যদের এক জায়গায় একসঙ্গে রাখার ব্যাপারটাকে তারা নিরাপদ মনে করে নি। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোকে বিভিন্ন ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে যুদ্ধ এবং অন্যান্য অজুহাতে বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। চতুর্থ বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে (আমার আর সাদেক নওয়াজের) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং একটিকে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ভারতীয় নকশালদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথা বলে শমসেরনগর পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আমার যুদ্ধ অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট সড়কে তিতাস নদীর ওপর শাহ্‌বাজপুর ব্রিজ এলাকায়। মেজর সাদেক নওয়াজের অবস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা সড়কে ওই নদীরই উজানিসার ব্রিজের কাছে। আমি আর সাদেক নওয়াজ তখন যথাক্রমে চার্লি ও ডেল্‌টা কোম্পানির কমান্ডার। যথারীতি আমরা যার যার যুদ্ধ অবস্থানে গিয়ে তিতাস নদীর পাড়ে ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার ইত্যাদি খুঁড়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। প্রস্তুতি শেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের ওয়াপদা রেস্ট হাউস সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান নিলাম। আমরা কয়েকজন অফিসার ও জওয়ানরা ছিলাম তাঁবু পেতে। তবে নিয়মিতভাবে যুদ্ধ অবস্থান রেকি (যুদ্ধকালীন অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ) করা হচ্ছিল। নোটিশ পাওয়া মাত্রই যুদ্ধ অবস্থানে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ ছিল আমাদের ওপর। আমার কোম্পানিতে আমি ছাড়া বাঙালি অফিসার ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কবির (এখন মেজর জেনারেল)। সাদেক নওয়াজের কোম্পানিতে ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হারুন (এখন মেজর জেনারেল)। দু' কোম্পানির জন্যই ছিল একজন বাঙালি ডাক্তার, লেফটেন্যান্ট আখতার আহমেদ (এখন অব. মেজর)। আমার স্ত্রী এবং চার ও তিন বছর বয়েসী দুই শিশুপুত্র তখন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের অফিসিয়াল ফ্যামিলি কোয়ার্টারে।

মার্চের দিনগুলো

৩ মার্চ থেকে দেশের পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তাল ও জঙ্গি হতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি ক্রমেই স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে রেডিওতে একটা দেশাত্মবোধক গানের (পূর্বের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে, আলোয় আলোকময়...) সুর কিছুক্ষণ পরপর বাজানো হতো, যার আবেদন আমার মতো অনেকেরই রক্তে আগুন ধরিয়ে দিতো। চারদিক তখন বিভিন্ন শ্লোগানে মুখর। 'পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'— রক্ত গরম করা সব শ্লোগান। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশনসহ পুরো প্রশাসন তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলছে। বাংলাদেশে পাকিস্তান নামক দেশটির অস্তিত্ব তখন ক্যান্টনমেন্ট এলাকার চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ। সামরিক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জনতার এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে না পারলেও আমরা বাঙালি অফিসার ও সাধারণ সৈনিকেরা চলমান ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত ও আলোড়িত হচ্ছিলাম। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে কবির, হারুন, আখতারের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতাম। এই তিনজন অফিসারের দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শ সঙ্কটময় মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে আমাকে। এছাড়া হাবিলদার বেলায়েত, শহীদ, মনির, ইউনুস, মইনুল এবং জওয়ানদের অনেকের সার্বক্ষণিক সতর্কতা

উল্লেখের দাবি রাখে। এসব এনসিও (নন-কমিশন্ড অফিসার) ও জওয়ানদের অনেকেই পরে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হন। কবির, হারুন, আখতারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে স্থির করলাম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিলেও আমরা সেটা মেনে নেবো না। বরং বিদ্রোহ করে বেরিয়ে গিয়ে জনগণের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবো। বাংলাদেশের পক্ষে লড়বো। এর মধ্যে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে খবর এলো, সেখানে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তাক করে বিভিন্ন অবস্থানে মেশিনগান, মর্টার ইত্যাদি বসানো হয়েছে। আমরা সবাই এ খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। দু'দিন পরপর কুমিল্লা থেকে রেশন আনার জন্য এনসিওরা যেতো। এছাড়া সিএমএইচ থেকে ফিরে আসা কিংবা ছুটি শেষে যোগ দেয়া জওয়ান বা অফিসারদের কাছ থেকে বিভিন্ন খবর পাওয়া যেতো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজের অজুহাতেও এনসিওদের কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে পাঠাতাম। তাদেরকে দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবাইকে সতর্ক থাকতে বলে পাঠালাম। সেন্ট্রি ডিউটি দ্বিগুণ করার পরামর্শ দিলাম। পাকিস্তানিরা নির্দেশ দিলে অস্ত্র সমর্পণ না করে তেমন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহ এবং প্রয়োজনে যুদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দিলাম।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

মার্চের ৭ তারিখে ক্যান্টনমেন্টে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে আমার বাবা ও শ্বশুর কুমিল্লায় এসে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলেকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেদিনই রেসকোর্সে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু। ৮ মার্চ রেডিওতে সেই ভাষণ শুনলাম আমরা। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে একদিক থেকে অনেকটা নিস্তেজই হয়ে পড়লাম। এতোদিন সলাপরামর্শ করে বিদ্রোহ করার জন্য মানসিক দিক থেকে একরকম প্রস্তুত ছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু ওই ভাষণ না দিলে হয়তো সেদিনই কিছু একটা করে বসতাম। কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সেরকম কোনো নির্দেশ দিলেন না। মনে মনে তাঁর কাছ থেকে একটা আদেশ চাইছিলাম আমরা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা বললেও তা একটি বিলম্বিত সংগ্রামের আহ্বান বলে মনে হলো আমাদের কাছে। আমি ভাবছিলাম, প্রথমে আক্রমণ করতে পারলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা এড়াতে পারতাম। এখন এরাই হয়তো সে সুযোগটা নেবে। তাই ক'দিনের উত্তেজনায় টান টান আমরা ক'জন একটু ঝিমিয়েই পড়লাম। তবে বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বান, 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'— আমাদের মধ্যে আবার দ্রুত উদ্দীপনা ফিরিয়ে আনলো। পরে ভেবে

দেখেছিলাম, তাৎক্ষণিক উদ্যোগের কথা না থাকলেও বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণে যুদ্ধের ইঙ্গিত ও দিক-নির্দেশনা তো ছিল। সবকিছু মিলিয়ে তখন একটা উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটতে লাগলো।

দু'একদিন পর লে. কর্নেল সালাউদ্দিন মুহাম্মদ রেজা [পরে (অব.) কর্নেল] ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলেন। তিনি ঢাকার আর্মি রিক্রুটিং অফিসের সিও ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই তাঁর বাড়ি। একজন আত্মীয়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন তিনি। লে. কর্নেল রেজার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি জানালেন যে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটার পর একটা আর্মি ইউনিট ঢাকায় আসছে। এসব দেখে খারাপ কিছু একটা ঘটার আশঙ্কা করে কিছু অফিসার কর্নেল (অব.) ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কিন্তু ওসমানী নাকি তাদের কথার তেমন একটা আমল দেন নি। যুদ্ধ করার কথা তখনো ভাবছিলেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে ঢাকায় বাঙালি অফিসাররা প্রচণ্ড অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন। লে. কর্নেল রেজা আমাদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। একসময় আমাকে বললেন, তোমার কোতে (Kote— সাধারণত যে ঘর বা তাঁবুতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাখা হয়) চলো, দেখি অস্ত্রশস্ত্র কেমন আছে। তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রগুলো দেখালাম। আমার কোম্পানির যাবতীয় অস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। এমনকি যারা ছুটিতে ছিল তাদের অস্ত্রও বাদ দিই নি। লে. কর্নেল রেজা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সতর্কতা দেখে বেশ খুশি হলেন। তিনি আরো বলেছিলেন, তোমাদেরকে ইন্সট্রাকশন দেয়ার মতো কেউ নেই। ওসমানী সাহেব এধরনের কোনো কিছু ভাবছেনই না। যা করার তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কারো নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থেকো না। আমিও সময়-সুযোগ মতো তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবো। লে. কর্নেল রেজা সত্যিই ২৯ মার্চ অসুস্থ অবস্থাতেই ঢাকা থেকে হেঁটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে এসেছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পা ভীষণরকম ফুলে গিয়েছিল। মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর কলকাতা চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা তিনি সেখানেই ছিলেন। ওসমানীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকায় লে. কর্নেল রেজাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। দুঃখজনকভাবে তাঁর মতো একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে মুক্তিযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে হয়। উল্লেখ্য, সালাউদ্দিন রেজাই ছিলেন একমাত্র কর্মরত লে. কর্নেল, যিনি নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে ২৯ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে এসেছিলেন।

১১ মার্চ কুমিল্লা থেকে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমাকে নির্দেশ দিলেন ৩১ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়নের ১৭টি ট্রাকের একটা কনভয় (গোলাবারুদ ও রেশনবাহী সামরিক যানের বহর) এসকর্ট করে সিলেট পৌঁছে দিতে। ব্যাটালিয়নটি তখন

ছিল সিলেটের খাদিমনগরে। ইতিমধ্যেই পথে বেশ কয়েকবার জনতার বাধার সম্মুখীন হতে হতে ট্রাক কনভয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছেছিল। শামসুল হক নামে চতুর্থ বেঙ্গলের একজন নায়েব সুবেদার দশজন বাঙালি জওয়ানকে সঙ্গে করে কনভয়টি ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিয়ে আসেন। তাদের সঙ্গে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল। কনভয়টিতে ছিল তেলসহ বিভিন্ন রসদ। এতোগুলো ট্রাক নিরাপদে সিলেট পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাকে দেয়া হলো মাত্র একটা প্লাটুন (৩৫জন সৈন্য)। রাস্তায় ৫/৬ মাইল পরপরই সামনে বড়ো বড়ো গাছের ব্যারিকেড পড়তে লাগলো। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী জনগণ পাকিস্তানিদের জন্য রসদ নিয়ে যেতে দেবে না। আমি ও আমার সঙ্গী সৈন্যরা প্রতিটি ব্যারিকেডে অনেক কষ্টে সংগ্রাম কমিটির সদস্য ও সাধারণ লোকদের বোঝালাম যে, রসদ পৌঁছে দিতে না পারলে আমাদের বন্দি করে কোর্ট মার্শাল করা হবে। সময়মতো আমরা অবশ্যই আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবো। আর্মি কনভয় এমনিতেই ধীরগতিতে চলে, তার ওপর এতোগুলো ব্যারিকেডের কারণে ১২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করতে ২/৩ দিন লেগে গেলো। ১৬ মার্চ সিলেট পৌঁছুলাম আমরা। পৌঁছুবার পর ৩১ পাঞ্জাবের কমান্ডিং অফিসার সাফল্যের সঙ্গে কনভয় নিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানালেন আমাকে। তারপর তাদের ছাউনিতে থাকার এবং আমাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের কোতে জমা দেয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি। কিন্তু পাকিস্তানিদের মতলব বুঝতে পেরে আমি তাতে রাজি হলাম না। সিনিয়র এনসিওরা আমাকে বলেছিল, আমরা একটা 'অপারেশনাল এরিয়া' থেকে এসেছি, তাই আমরা নিজেদের অস্ত্র দিয়েই একটা ছোটোখাটো অস্ত্রাগার বানিয়ে রাখবো। সিওকে আমার মতামত জানিয়ে দেয়া হলো। তিনি আর এ ব্যাপারে চাপাচাপি করলেন না। পরে মনে হয়েছে, ঐ সময় পাকিস্তানিরা বেশি জোরাজুরি করে নি এজন্য যে, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরিকল্পনাটি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারতো।

তারা চায় নি বাধ্য হয়ে আমরা এমন একটা কিছু করি, যাতে ২৫ মার্চের আগেই পরিস্থিতি বদলে যায়। যাই হোক, আমাকে বলা হলো, শিগ্‌গিরই আমার পরবর্তী অর্ডার আসবে। Unofficially বলা হলো, সিলেটে বিভিন্ন চা-বাগানে কর্মরত অবাঙালি অফিসারদের পরিবারকে এসকর্ট করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। তাদের জড়ো করতে সময় লাগবে এবং সে পর্যন্ত আমাদের ৩১ পাঞ্জাবের সঙ্গেই থাকতে হবে। পরদিন (১৭ মার্চ) আমার প্রতি কি অর্ডার আছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কেউই কিছু বললো না। কুমিল্লায় আমাদের ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সঙ্গেও আমাকে টেলিফোনে কথা বলতে দেয়া হলো না। শেষে কুমিল্লার বাঙালি এস এম (সুবেদার মেজর) ইদ্রিস মিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হলো। তার সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমার অধীনে একজন বিশ্বস্ত জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) হিসেবে কুমিল্লা ও

জয়দেবপুরে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ইদ্রিস মিয়াকে বললাম, 'কিছু বুঝতে পারছেন ইদ্রিস সাহেব? এরা আমাকে কোনো অর্ডারও দিচ্ছে না, যেতেও দিচ্ছে না...।' তিনি উত্তর দিলেন, 'স্যার, সবই বুঝছি। আপনি কিছু বলবেন না, আমি সিও সাহেবকে বলবো তিনি যেন আপনাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে আসেন।' অধিনায়কের ওপর একজন সুবেদার মেজর প্রচুর প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। চতুর্থ বেঙ্গলে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি অফিসারের সঙ্গে পরামর্শ করে ইদ্রিস মিয়া আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সিওকে চাপ দিলেন। শেষ পর্যন্ত সিও কর্নেল খিজির হায়াত খান কুমিল্লা ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইকবাল শফির সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে আসবার নির্দেশ দেন। ১৯ মার্চ আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে এলাম। চারদিকে তখন চাপা উত্তেজনা।

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের অস্বাভাবিক ঘটনা

যুদ্ধ বোধহয় করতেই হবে এরকমই মনে হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদ কানে আসছিল। আর ক্রমশই বাড়ছিল উত্তেজনা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমি সব সময় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত বাকি দুই কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। সুবেদার আবদুল ওহাব খবর আদান-প্রদানে আমাকে খুব সাহায্য করতো। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম, মেশিনগান ও মর্টার তাক করা ছাড়াও পাকিস্তানিরা আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে উঁচু পাহাড়ে পরিখা খনন করছে। জিগ্যেস করলে তারা বলতো, ট্রেনিং-এর কাজ করা হচ্ছে। পুরো মার্চ মাস ধরেই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এধরনের বিভিন্ন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে থাকে। আমাদের ইউনিট লাইনের চারদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসার ও জেসিও, বিশেষ করে আর্টিলারি বাহিনীর লোকজন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতো। কমান্ডারসহ ব্রিগেডের অন্যান্য অফিসার প্রায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে ইউনিট লাইন পরিদর্শনে আসতেন। ব্রিগেড কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সপ্তাহে একবার সৈন্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতেন, যেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হতো না। এছাড়া চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও জেসিওদের সঙ্গে ব্রিগেডের অফিসার ও জেসিওদের প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হতো, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সাধারণত যেটা ঘটে থাকে ছয় মাসে একবার কি দু'বার। এসময় খেলার মাঠে নিরাপত্তার জন্য অন্য রেজিমেন্টের সশস্ত্র প্রোটেকশন পার্টি নিযুক্ত করা হয়। আরো আশ্চর্যের বিষয়, আমাদেরকে ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছিল, অথচ সেই জরুরি পরিস্থিতিতেও অস্বাভাবিকভাবে ছুটির ওপর কোনো কড়াকড়ি আরোপ করা হয় নি। বরং চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার ও ব্রিগেড কমান্ডার জওয়ানদেরকে

বলেন, যে যার ইচ্ছেমতো ছুটি নিতে পারো। এদিকে ১৮/১৯ তারিখে আর্টিলারি থেকে একজন বাঙালি সৈনিক এসে খবর দেয়, চতুর্থ বেঙ্গলের ইউনিট লাইনের ওপর সেদিন রাতে পাকিস্তানিরা হামলা করবে। একথা শুনে চতুর্থ বেঙ্গলের বাঙালি সৈন্যরা ক্যাপ্টেন মতিনের পরামর্শে এবং এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন গাফফারের উদ্যোগে ও নির্দেশে অস্ত্রাগার থেকে যার যার অস্ত্র বের করে হামলা মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানিরা আর হামলা করে নি। পরদিন চতুর্থ বেঙ্গলের সৈন্যরা অস্ত্র ফেরত দেয়ার সময় বিনা নির্দেশে অস্ত্র বের করার জন্য তাদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় নি। সিও স্বয়ং এ ঘটনা জেনেও তাদের কিছু বলেন নি।

একের পর এক এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনায় সন্দিহান হয়ে পড়ি আমি। সুবেদার ওহাবকে দিয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে বলে পাঠাই সবাইকে সতর্ক থাকতে। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পর কুমিল্লা থেকে আমার ও সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির উদ্বৃত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিয়ে আসি। আমার আশঙ্কা ছিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের দুই কোম্পানি সৈন্যকে পাকিস্তানিরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করবে। এ আশঙ্কা থেকে সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিই আমি। পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমার ও সাদেক নেওয়াজের কোম্পানির জেসিওদেরকে আত্মরক্ষার জন্য ক্যাম্পের চারদিকে পরিখা খোঁড়ার নির্দেশ দিই। কাজগুলো করতে হয়েছে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। কারণ পাঞ্জাবি অফিসার সাদেক নেওয়াজ আমার গতিবিধির ওপর সবসময় নজর রাখতো। প্রায়ই সে আমাকে জিগ্যেস করতো এই সব পরিখা খনন, পজিশন নেয়ার উদ্দেশ্য কি। আমি উত্তর দিতাম, জওয়ানদের ডিগিং এবং পজিশন নেয়ার অনুশীলন করাচ্ছি। এছাড়া বিশৃঙ্খল জনতার সম্ভাব্য হামলা থেকে সেনাসদস্য ও অস্ত্র-গোলাবারুদ রক্ষার অজুহাত দেখিয়েছিলাম। কুমিল্লার সঙ্গে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্যাম্পের যোগাযোগের মাধ্যম ছিল একমাত্র টেলিফোন এবং একটি সিগন্যাল সেট। সিগন্যাল সেটটি অপারেট করতো পাকিস্তানিরা। অস্বাভাবিকভাবে এই সেট দিয়ে কুমিল্লা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো, যদিও কোম্পানি পর্যায়ে ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করারই নিয়ম ছিল। এসময় আমি খুব অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। সব সময় মনে হতো, কুমিল্লায় থেকে-যাওয়া জুনিয়র বাঙালি অফিসাররা যদি সময়মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে হয়তো ব্যাটালিয়নের অর্ধেক অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং সৈন্য হারাতে হবে।

এদিকে ২৩ মার্চ ঢাকায় জঙ্গি ছাত্র যুব কর্মীরা ঢাকা বিশ্বদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেয়।

২৪ মার্চ বিকেলে ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী রাশিদা ফোন করলো। কুশলাদি বিনিময়ের পর রাশিদা বললো, 'ঢাকার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে যুদ্ধ

অনিবার্য। যুদ্ধ তোমাদেরকে করতেই হবে। সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করো না।' আমি বলেছিলাম, নিরস্ত্র দেশবাসীর পাশে তো আমাদের দাঁড়াতেই হবে। আমি সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় আছি। একজন গৃহবধূর এই চেতনা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। রাশিদার সঙ্গে এরপর বেশ কিছুদিন যোগাযোগ হয় নি। দেখা হয় একেবারে মে'র ২০/২২ তারিখে ভারতের আগরতলায়।

খালেদ মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাৎ

এদিকে চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে মেজর খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং শহীদ) ২২ মার্চ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে এলেন। এর আগে তিনি ঢাকায় পদাতিক ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদ ব্রিগেড মেজরের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কয়েক ঘন্টার নোটিশেই তাঁকে ঢাকা থেকে কুমিল্লায় বদলি করা হয়। ২৪ মার্চ তাঁকে একটা কোম্পানি নিয়ে সেদিনই সীমান্তবর্তী এলাকা শমসেরনগরে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। খালেদ মোশাররফকে বলা হয়েছিল, শমসেরনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নকশালরা পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছে। তাদেরকে দমন করতে হবে। শমসেরনগর যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমার সঙ্গে খালেদ মোশাররফের দেখা হয়। কুমিল্লা থেকে শমসেরনগর যেতে হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়েই যেতে হয়। গভীর রাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছান খালেদ মোশাররফ। শহরের ওই অংশে তখন প্রচুর ব্যারিকেড। ব্যারিকেড সরাতে সরাতেই ধীর গতিতে এগুচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু শহরের নিয়াজ পার্কের কাছের সেতুটির সামনে ছাত্র-জনতার প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হলো তাঁকে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে কয়েক হাজার লোক রাস্তায় শুয়ে পড়ে জানায়, সামরিক বাহিনীর কোনো কনভয় যেতে দেয়া হবে না। তৎকালীন সাংসদ লুৎফুল হাই সাচ্চু, আলী আজমসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রনেতা খালেদ মোশাররফকে বলেন, বাংলাদেশের অনেক জায়গায় পাকসেনারা আবার গুলি চালিয়েছে এবং মিলিটারির চলাচল কেন্দ্রীয় নির্দেশে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। তারা আরো বলেন, পাকিস্তানিরা বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কুমিল্লা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। নেতৃবৃন্দ তাদেরকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানান।

খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গেলাম। উপস্থিত নেতৃবৃন্দসহ জনতাকে ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলার জন্য বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা কিছুতেই রাজি হলো না। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলে। আমরা তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলাম, বেঙ্গল রেজিমেন্ট বাংলাদেশেরই রেজিমেন্ট। বাঙালির প্রয়োজনের সময় এই রেজিমেন্ট পিছিয়ে থাকবে না ; কিন্তু এখন আমাদেরকে

বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ব্যারিকেড উঠিয়ে নিতে সম্মত হলেন। খালেদ মোশাররফকে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে এলাম। ক্যাম্পে তাঁর সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি এবং আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হলো। রাতের খাবারের সময় মেজর খালেদ বললেন, পাকিস্তানিরা পার্লামেন্ট বসতে দেবে না, ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। একটা গণহত্যা ঘটানোর পরিকল্পনা চলছে। আমাদের সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। সিভিলিয়ানের বেশে পিআইএ-এর বিমানে করে বেশ কিছু পাকিস্তানি ব্যাটালিয়ন ঢাকায় এনেছে তারা। এছাড়া জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্রও আনা হয়েছে। ক্র্যাকডাউন হবেই এবং তাহলে বাঙালি সৈন্যদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাই তারা আগে বাঙালি সৈন্যদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলার চক্রান্ত করছে। খালেদের এই চেতনাটা বাংলাদেশের সেই সময়কার চাকরিরত অনেক অফিসারের ভেতরেই অনুপস্থিত ছিল। যার ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রথমপর্বে (২৫ মার্চ থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত) সেনাবাহিনীতে চাকরিরত মাত্র ২৫ থেকে ৩০জন অফিসার সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগদান করেন। পুরো মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানে কমিশনপ্রাপ্ত বাঙালি অফিসার বলতে ছিলেন এঁরাই। তখন বেশির ভাগ বাঙালি অফিসারেরই পোস্টিং ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানে। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে কর্মরত এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছুটি বা বিভিন্ন উপলক্ষে এদেশে এসেছেন, আবার চলে গেছেন এমন অফিসারের মোট সংখ্যা দেড় শতের মতো ছিলো। অর্থাৎ দেড়শো অফিসারেরই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ ছিলো। অথচ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন উল্লিখিত ২৫/৩০ জনই। এদিক দিয়ে অফিসারদের তুলনায় সাধারণ সৈন্যদের ভেতরেই সংগ্রামী চেতনা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এই চেতনা ও দূরদৃষ্টির অভাবেই বহু বাঙালি অফিসার অসহায়ভাবে বন্দি ও পরবর্তীকালে নিহত হন। যাই হোক, খালেদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ঢাকার খবর পাওয়া ছাড়াও আর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো, তা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের একটা ব্যবস্থা করে গেলেন তিনি। খালেদ মোশাররফ আমাকে একটা বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে দিয়ে বললেন, প্রয়োজন হলে এতে টিউনিং করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। যোগাযোগের একটা উপায় পেয়ে আমি খানিকটা ভরসা পেলাম।

সিও এলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

পরদিন, অর্থাৎ ২৫ মার্চ সন্ধ্যায়, কুমিল্লা থেকে নির্দেশ এলো, আরো লোক আসছে। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সে অনুযায়ী ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু জানতাম না কারা আসছে। রাত আটটার দিকে সিও কর্নেল মালিক খিজির হায়াত খান কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাকি কোম্পানিগুলো নিয়ে উপস্থিত হলেন। সিওর সঙ্গে এলো ক্যাপ্টেন মতিন

(পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), ক্যাপ্টেন গাফফার (পরে লে. কর্নেল অব.), লে. আমজাদ সাইদ (পাকিস্তানি অফিসার) ও ডা. লে. আবুল হোসেন (পরে ব্রিগেডিয়ার)। ডা. আবুল হোসেন এসেছিল আখতারের বদলে টেম্পোরারি ডিউটিতে। আখতারের পোস্টিং অর্ডার নিয়ে এসেছিল সে। আখতারের পোস্টিং হয়েছিল আজাদ কাশ্মিরের একটি স্টেশনে। সিও বললেন, যুদ্ধ আসন্ন বলে ব্রিগেড কমান্ডার তাকে কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গলের প্রায় সব সৈন্যকে দিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ক্যান্টনমেন্টে তখন রয়েছে শুধু LOB (Left out of Battle) সেনা সদস্যরা, অর্থাৎ বয়স্ক, অবসর অত্যাসন্ন এমন, কিংবা অসুস্থ এবং পাহারায় নিয়োজিত অল্পসংখ্যক সৈন্য। রাত ১১টার দিকে সিও আমাকে শাহবাজপুরে আমার অবস্থানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো রওনা হয়ে গেলাম। ১২ মাইল দূরের গন্তব্যে পৌছুলাম রাত তিনটার দিকে। তারপর তিতাস নদীর পাড়ে খোঁড়া ট্রেঞ্চে অবস্থান নিলাম আমরা। কিন্তু সকাল ছ'টাতেই (২৬ মার্চ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফিরে যাওয়ার আদেশ এলো। কি আর করা! ঘণ্টাখানেক পর আবার রওনা হলাম ব্রাহ্মবাড়িয়ার দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুদূরে যেতেই দেখলাম রাস্তার ওপর পড়ে আছে বিশাল একটা গাছ। পড়ে আছে মানে কেটে ফেলে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে আর কি! অথচ ঘণ্টা তিনেক আগেও রাস্তা ছিল একেবারে পরিষ্কার। বুঝতে পারলাম জনতা সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্যই এ কাজ করেছে। পরে জেনেছিলাম পঁচিশে মার্চের রাতে ঢাকায় পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের খবর সেই রাতে পেয়েই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনতা শেষ রাতের দিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলো ব্যারিকেড তৈরি করে। যাই হোক, জওয়ানরা গাড়ি থেকে নেমে গাছ কেটে রাস্তা থেকে সরানোর পর আবার যাত্রা শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতেই আবার ব্যারিকেড। ১২ মাইল পথে অন্তত কুড়ি জায়গায় এরকম ব্যারিকেড সরিয়ে এগুতে হলো। রাস্তা একদম ফাঁকা। কোনো লোকজনের দেখা পাচ্ছিলাম না। ব্যারিকেডের কারণে ১২ মাইল রাস্তা পেরোতে ঘণ্টা তিনেক লেগে গেলো। দশটার দিকে ক্যাম্পে পৌছে দেখলাম সাদেক নওয়াজ, ক্যাপ্টেন গাফফার, লেফটেন্যান্ট আমজাদ, লেফটেন্যান্ট আখতার, হারুন এদেরকে নিয়ে সিও বসে আছেন। আমার সঙ্গে ছিল সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট কবির। সিও এবং অন্যদেরকে বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। সিও আমাকে জানালেন, দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন মতিনের কোম্পানিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পাঠানো হয়েছে সান্ধ্য আইন কার্যকর করার জন্য। তিনি আমাকে তখুনি পুলিশ লাইনে গিয়ে পুলিশদের নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাকে বললাম, পুলিশদের নিরস্ত্র করতে গেলে অহেতুক গোলাগুলি, রক্তপাত হবে। সিও অবশ্য প্রথমটায় চেয়েছিলেন সাদেক নেওয়াজ গিয়ে প্রয়োজনবোধে শক্তি প্রয়োগ করে

পুলিশদের নিরস্ত্র করুক। রক্তপাত এড়ানোর জন্য আমি সিও-কে পরদিন নিজে গিয়ে পুলিশের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমার কথায় তখনকার মতো নিবৃত্ত হলেন তিনি।

যুদ্ধের পূর্বাভাস

দুপুরের দিকে সিগন্যাল জেসিও নায়েব সুবেদার জহির তার ওয়্যারলেস সেট র‍্যানডম স্ক্যানিং করার সময় কিছু অর্থপূর্ণ ম্যাসেজ ইন্টারসেপ্ট করে। ম্যাসেজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সে আমাকে তা জানাতে এলো। পাক আর্মির দুটো স্টেশনের মধ্যে উর্দু ও ইংরেজিতে কথাবার্তাগুলো ছিল এরকম—আরো ট্যাঙ্ক অ্যামুনিশন দরকার... হেলিকপ্টার পাঠানোর ব্যবস্থা কর। আমাদের অনেক ক্যাজুয়েলিটি হচ্ছে... EBRC-র (East Bengal Regimental Centre) অর্ধেক সৈন্য অস্ত্রসহ অথবা অস্ত্র ছাড়া বেরিয়ে গেছে ইত্যাদি। বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। যুদ্ধ কি তাহলে শুরু হয়ে গেলো! হারুন, কবির আর আখতারকে নিয়ে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে বসলাম। ম্যাসেজগুলো পেয়ে ওরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতি যে গুরুতর, সে বিষয়ে সবাই একমত হলো। বিশ্বস্ত জেসিও, এনসিওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলাম। দেখলাম আমাদের চেয়ে তারা এক ধাপ এগিয়ে। জেসিও-এনসিওরা জানালো, তারা পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে, কেবল আদেশের অপেক্ষা। একটু আশ্বস্ত হলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ দেখতে পেলাম শত শত লোক ঢাকার দিক থেকে পালিয়ে আসছে। নারী-পুরুষ আর শিশুদের ঐসব দলকে জনস্রোত বললেই বোধহয় দৃশ্যটার সঠিক বর্ণনা দেয়া হয়। তাদের মুখে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা আর পথশ্রমের ছাপ। কেউ আসছে গোকর্ণঘাট হয়ে, অনেকে আসছে ঢাকা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল লাইন ধরে স্রেফ হাঁটাপথে। পালিয়ে আসা লোকগুলোর সঙ্গে আগে কথা বলার চেষ্টা করলাম। আর্মির পোশাক দেখে অনেকেই ভয়ে রাস্তা ছেড়ে মাঠ দিয়ে হাঁটা শুরু করলো। আমরা বাংলায় কথা বলছি দেখে সাহস করে যে দু'একজন এলো, তাদের কাছ থেকে জানলাম, ঢাকায় গতকাল অর্থাৎ ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি আর্মি সাধারণ মানুষের ওপর ট্যাঙ্কসহ ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে। বহু লোক মারা গেছে। কথা বলার মতো মানসিক অবস্থাও অনেকের ছিল না। তারা শুধু বলছিল, আগুন... গুলি... ঢাকা শেষ... লাখ লাখ লোক মারা গেছে— এই রকম অসংলগ্ন কথা। এরপর আর বুঝতে বাকি রইলো না কিছু। বুঝলাম আর দেরি নয়, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা। জওয়ানদের মনোভাব এর মধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার দিকে জহিরের সিগন্যাল সেট দিয়ে শমসেরনগরে মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। ঢাকাইয়া বাংলায় ইন্টারসেপ্টেড

মেসেজগুলো শুনিয়ে তার মতামত জানতে চাইলাম। বললাম, পুরো ব্যাটালিয়ন এখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার শিকার হয়ে লোকজন যে ঢাকা থেকে পালিয়ে আসছে তাও জানলাম। খালেদ মোশাররফকে বললাম আমরা তৈরি। তাকে তাড়াতাড়ি কোম্পানি নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসার অনুরোধ করলাম। আমাদের কথোপকথনের সময় সাদেক নেওয়াজ, আমজাদ এবং সিও খিজির হায়াত খান খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন বলে বেশি কথা বলা সম্ভব হয় নি। খালেদ মোশাররফও শমসেরনগর থেকে বেশি কথা বলেন নি। সব শুনে তিনি একটি মাত্র কথা বললেন, 'আমি রাতের অপেক্ষায় আছি।' মেজর খালেদের এই একটি কথা থেকেই বুঝে নিলাম কি বলতে চাইছেন তিনি। বুঝলাম, তিনি বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং আজ রাতেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন। ২৭ মার্চ বেলা তিনটা নাগাদ তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ হয় নি। শমসেরনগর যাওয়ার পর তাঁর withdrawal route অর্থাৎ পশ্চাদপসরণের রাস্তা পাকিস্তানিরা ৩১ পাঞ্জাব-এর এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল। তাই তিনি চা বাগানের ভেতর দিয়ে বিকল্প রাস্তা ধরে পরদিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ বেলা প্রায় তিনটার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছান।

অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে উত্তেজনা

খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা হওয়ার পর থেকেই জুনিয়র অফিসাররা দ্রুত কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাকে চাপ দিচ্ছিল। সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ শুনে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তখুনি অস্ত্র তুলে নেয়ার নির্দেশদানের জন্য তারা আমাকে পিড়াপিড়ি করতে থাকে। আমি ব্যাটালিয়নের অন্য কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ জুনিয়র অফিসারের চূড়ান্ত মতামতের অপেক্ষা করছিলাম। কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল কিংবা সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী না হলে সব পণ্ড হয়ে যাবে এবং অপ্রয়োজনীয়ভাবে লোকক্ষয় ঘটবে। দ্বিধাগ্রস্ত একজন অফিসার ও জ্যেষ্ঠ একজন জেসিওকে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য সারারাত সময় দিলাম।

সন্ধ্যার একটু পর আমার কোম্পানির সৈন্যদের দেখতে টেন্টে গেলাম। সঙ্গে কবির, আখতার, হারুন ছাড়াও বেলায়েত, শহীদ, মুনীর, ইউনুস, মইনুলসহ কয়েকজন বিশ্বস্ত এনসিও। পাকিস্তান আর্মিতে অফিসার ও সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব ছিল। তাই সৈন্যরা কেউ অফিসারদের কাছে খোলামেলাভাবে মনের কথা বলতো না। যাই হোক, সৈন্যরা এই সময় বসে তাস খেলছিল। আমাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়ালো। একজন আমার কাছে এসে বললো, 'স্যার, বাংলাদেশে যে কি হইতাছে তাতো জানেন।

আমরাও সব বুঝি, জানি এবং খেয়াল রাখি। সময়মতো ডিসিশন দিয়া দিয়েন, না দিলে আমগোরে পাইবেন না। যার যার অস্ত্র নিয়া যামুগা।' জওয়ানরাও আমাদের মতো করে ভাবছে দেখে গর্বিত ও আশান্বিত হলাম আমি। কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে কেবল পিঠ চাপড়ে দিয়ে আশ্বস্ত করতে চাইলাম তাকে। এতোক্ষণে পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম, তারা আমাদের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র। জাতির দুর্ভাগ্য, সামরিক অফিসারদের সবাই এদের মতো চেতনা, সতর্কতা এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিলেন না, তাই সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি। পারলে হয়তো পাকিস্তানিদের পক্ষে মাত্র ৪ থেকে ৫শ' সৈন্য দিয়ে চট্টগ্রামে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রধারী আমাদের দুই হাজার যোদ্ধাকে কাবু করা সম্ভব হতো না এবং যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেটাও হতো না। চট্টগ্রাম মুক্তাঞ্চল হিসেবে আমাদের অধিকারে থাকলে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধাসহ সমগ্র অঞ্চলটি মুক্তিযুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারতো। শুধু শুভপুর (ফেনী)-সীতাকুন্ড এলাকাটি দখলে রাখতে পারলে এর দক্ষিণে পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিস্তীর্ণ মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা যেতো। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল এবং তিনটি আংশিক ব্যাটালিয়নের (প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম) সহায়তায় এটা করা অসম্ভব ছিল না। আর তাহলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থনের জন্য কোনো একটি রাষ্ট্রের ওপর আমাদের নির্ভরশীলতাও বহুলাংশে হ্রাস পেতো।

রাতে আমরা কয়েকজন টেন্টের সামনে ক্যাম্প চেয়ারে বসে আছি। এমন সময় দেখলাম, সিও খিজির হায়াত এস এম ইদ্রিস মিয়া আরো কয়েকজন জেসিও-কে নিয়ে সৈন্যদের টেন্টের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছেন। সৈন্যদের টেন্ট ছিল আমাদের থেকে খানিকটা দূরে। সিও-র গতিবিধি দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধের মনে হচ্ছিল না। এসময় এনসিও বেলায়েত, শহীদ, মনির আমাকে বললো, 'স্যার আজ রাতে আমরা আপনার টেন্ট পাহারা দেবো। পাঞ্জাবিদের মতিগতি ভালো নয়। রাতে কোনো পাঞ্জাবি অফিসার অস্ত্র হাতে কাছে এলে সোজা গুলি চালাবো। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন।'

সে রাতে জনা দশেক এনসিও এবং জওয়ান পালা করে আমার টেন্ট পাহারা দেয়, যদিও হাবিলদাররা কখনো পাহারা দেয় না, সেটা সিপাইদের কাজ। কিন্তু আমি ওদেরকে বারণ করতে পারলাম না। মেজর সাদেক নেওয়াজ এবং লে. আমজাদও সারারাত আমার তাঁবুর ১০০/১৫০ গজ দূর থেকে আমার ওপর নজর রাখে। পাঞ্জাবি অফিসার দু'জন সারারাত জেগে ছিল।

চিন্তাক্লিষ্ট মন নিয়েই গভীর রাতে কোনো একসময় ঘুমিয়ে পড়ি। শেষ রাতের দিকে একটা ফোন এলো। কোম্পানিগঞ্জ পিসিও থেকে একজন অপারেটর আমাদের এখানকার সিনিয়র বাঙালি অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে

চাইছিল। আমি ফোন ধরলে সে বললো, 'স্যার, আমি একজন সামান্য সরকারি কর্মচারী। একটা খবর দেয়া অতি জরুরি মনে করে এতো রাতে ফোন করে আপনার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটালাম। একটু আগে পাক আর্মির ১২টা ট্রাক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে রওনা হয়েছে। মিনিট পাঁচেক আগে তারা কোম্পানিগঞ্জ ত্যাগ করেছে।' বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে আসছে।

অবশেষে বিদ্রোহ

২৭ মার্চ ভোর হতেই সিও খবর পাঠালেন, তার অফিসে সকাল ন'টায় অফিসারদের মিটিং হবে। অবশ্য এরি মধ্যে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি। সোয়া সাতটায় অফিসার্স মেসের দিকে রওনা হলাম। সঙ্গে কবির ও হারুন এবং বেলায়েত, শহীদ, মুনিরসহ কয়েকজন জওয়ান। সবাই সশস্ত্র। আমাদের বের হতে দেখেই অন্য জওয়ানরা অ্যামুনিশনের বাক্স খুলে যার যার অস্ত্র লোড করা শুরু করলো। অফিসার্স মেসে গিয়ে সিও, সাদেক নওয়াজ, আমজাদ, গাফফার, আখতার আর আবুল হোসেনকে দেখলাম। আমরা নাশতার টেবিলে বসলাম। ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো। সিও নাশতা করছিলেন। তার পাশে বসা আমজাদ আর সাদেকের খাওয়া শেষ। খেতে খেতে সাদেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন সিও। একটু দূরে সোফায় বসা আখতার আর আবুল হোসেন। এমন সময় একজন জ্যেষ্ঠ জেসিও এসে সিওকে বললো, সাদেক নওয়াজের কোম্পানিতে একটা সমস্যা হয়েছে, তাই তাকে এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে। কথাটা শোনা মাত্র সিও তার সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন। আমজাদ আর সাদেকও উঠে দাঁড়ালো। আমার সন্দেহ হলো, সিও-কে সরিয়ে নিয়ে বিদ্রোহ বানচাল করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে না তো? দ্রুত উঠে সিওকে বাধা দিলাম আমি। বললাম, পরিস্থিতি না জেনে এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না, আগে সবাই অফিসে যাই। তারপর কথাবার্তা বলে কোম্পানিতে যাওয়া যাবে। তাছাড়া কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে সাদেক নওয়াজ আছে, আমি আছি। তাই তার এতো ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সিও আমার কথা মেনে নিলেন। সাদেক নওয়াজ তখন তার স্টেনগানটা আনার জন্য রুমে যেতে চাইলো। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, চাইলে আমার স্টেনগানটা নিতে পারে সে। এতে আশ্বস্ত হলো সাদেক। এরি আগে এক ফাঁকে আখতারকে সাদেকের রুমে পাঠিয়েছিলাম তার স্টেনগানটা সরিয়ে রাখার জন্য। এখন সাদেক তার ঘরে গেলে আখতার ধরা পড়ে যাবে। তাই কৌশলে ঠেকালাম ওকে। আখতার সাদেকের ঘরে গিয়ে আটটা ম্যাগাজিনসহ তার স্টেনটা নিয়ে নেয়। আমি সময় নষ্ট করতে চাইছিলাম না। পাক কনভয় আসার খবর তো পেয়েছিলামই, তাছাড়া এখানকার পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল (পরে জেনেছিলাম,

সকালের দিকে পাক কনভয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মাইল দুয়েকের মধ্যে পৌঁছানোর পর সম্ভবত আমাদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে ফিরে যায়)। যাই হোক, সবাইকে নিয়ে অফিসে গেলাম। অফিসটা ছিল একটা তাঁবুতে। পাকিস্তানি অফিসার তিনজন তাঁবুতে ঢুকে চেয়ারে বসা মাত্রই সশস্ত্র কবির আর হারুন দুপাশে দাঁড়ালো এবং আমি সিও ও অন্য দু'জনকে বললাম, "You have declared war against the unarmed people of our country. You have perpetrated genocide on our people. Under the circumstances, we owe our allegiance to the people of Bangladesh and the elected representatives of the people. You all are under arrest. Your personal safety is my responsibility. Please do not try to influence others."

বিদ্রোহ ঘটে গেলো। এতোক্ষণ ছিল একরকম পিন পতন নীরবতা। হঠাৎ দেখলাম ওয়াপদার তিনতলা কোয়ার্টার থেকে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ হাতে একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার আর ফাঁকা গুলি করতে করতে ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। গুলির আওয়াজ আর 'জয় বাংলা' শুনেই যেন সবার মধ্যে সংবিৎ ফিরে এলো। ক্যাম্পে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিলো জওয়ানরা। সামরিক বাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে কখন আর কোত্থেকেই-বা ওরা পতাকাটা পেলো, তখন আমার মাথায় সেটা ঢুকছিল না। বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে সিও-র টেন্টে কঠোর পাহারায় রেখে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমাকে দেখে জওয়ানরা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে উঠলো। একসঙ্গে পাঁচ-ছয়শ' জওয়ানের মুখে 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার। কয়েকজন উল্লাসে সমানে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, কেউ যেন এখন একটা গুলিও বাজে খরচ না করে। বলতে গেলে গালিগালাজ করেই জওয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলাম। সাময়িকভাবে ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলাম আমি।

গুলির আওয়াজ আর 'জয় বাংলা' ধ্বনি শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শহর এবং আশপাশের গ্রামগুলো থেকে পিল পিল করে অসংখ্য লোক এসে হাজির হলো ক্যাম্পে। অনেকের হাতে বল্লম, মাছ মারা কোচ এইসব দেশী অস্ত্র। এমন কি কয়েকটা মরচে-পড়া তলোয়ারও দেখলাম। জনতা শুধু পাকিস্তানি অফিসারদের চায়। ঐ উন্মত্ত লোকদের হাতে পড়লে পাকিস্তানি অফিসারদের অবস্থা কি দাঁড়াবে সেটা সহজেই অনুমেয়। কথা দিয়েছি, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার, তাই উত্তেজিত লোকজনকে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলাম। পাঞ্জাবি পরা বৃদ্ধটি পাকিস্তানিদের হত্যা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তেড়ে আসছিলেন। তাকে আমি স্টেনগানের বাঁট দিয়ে ঠেকালাম। সবাইকে বললাম,

এরা POW অর্থাৎ Prisoner of War। সুতরাং এদেরকে হত্যা করা যাবে না। আমরা এদের প্রতি জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য। তারপর প্রোটেকশনের জন্য বন্দি পাকিস্তানি অফিসার তিনজনকে আখতারের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় থানা হাজতে পাঠিয়ে দিলাম। আখতার গিয়ে সিআই-কে বলে, 'এদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনার। মেজর শাফায়াত বলেছেন, বন্দিদের কোনো ক্ষতি হলে আপনার রক্ষা নেই।' এর আগে কয়েকশ' সৈন্যের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' স্লোগান শুনে কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদূর যেতেই তারা জনতার হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়।

বিদ্রোহের প্রাথমিক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে এলে জওয়ানদের আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। কারণ পাকিস্তানি বাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। একজন অফিসারকে একদল জওয়ানসহ কুমিল্লার দিক থেকে পাকসেনাদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য শহরের দক্ষিণে অ্যান্ডারসন খালের পাশে অবস্থান নিতে পাঠালাম। বেলা তিনটার দিকে মেজর খালেদ মোশাররফ তার সেনাদল নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছুলে আমি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করলাম।

খালেদ মোশাররফের মিটিং

খালেদ মোশাররফ এসেই ঘোষণা করেছিলেন, বিকেল সাড়ে তিনটায় রেস্ট হাউসে অফিসার আর জেসিওদের এক মিটিং হবে। সবার ধারণা ছিল, খালেদ মোশাররফ ব্রিফিং দেয়ার পরই কুমিল্লা বা ঢাকার উদ্দেশ্যে মার্চ শুরু হবে। সবার মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা। জীবনে সামরিক শৃঙ্খলবদ্ধ অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটিত এই বিরাট পরিবর্তনে কয়েকজন অফিসার, জেসিও এবং এনসিও কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল। কারো গায়ে নিমেষেই প্রবল জ্বর উঠে যায়। একজন সুবেদারতো উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে গেলো। একজন জেসিও তেমন কথাবার্তা বলতো না, কিন্তু বিদ্রোহের পর তার মুখ থেকে কথার তুবড়ি ছুটতে লাগলো। অনবরত 'স্যার, আমাদের এই করতে হবে, সেই করতে হবে'— এসব বলে যাচ্ছিল। আমি নিজেও একটু অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। সভাকক্ষে উপস্থিত সবাই পুরো ব্যাটল্ ড্রেসে সজ্জিত। হেলমেটটা পর্যন্ত ঠিকঠাক থুঁতনির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। কিন্তু মিটিংয়ে সবার উত্তেজনার গনগনে আগুনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলেন খালেদ মোশাররফ। প্রথমে তিনি বিদ্রোহ করে বেরিয়ে আসার জন্য সবার তারিফ করলেন। তারপর বললেন, প্রাথমিক ৪৮ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তান আর্মি এখন পুরোপুরি সংগঠিত হয়ে গেছে। স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টগুলো এরি মধ্যে ওদের দখলে চলে গেছে। এখন আমরা আক্রমণ করলে কিছু পাকিস্তানি সৈন্য মারা গেলেও যুদ্ধে জেতা যাবে না। আমাদের লোক ও অস্ত্রবল খুবই সীমিত। আপাতত এর বেশি

সাপ্লাই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই—ঢাকা, কুমিল্লা বা চট্টগ্রামের খবরও আমরা সঠিক জানি না। আমাদের এখানকার খবর পাকিস্তান আর্মি এতোক্ষণে নিশ্চয়ই জেনে গেছে। কাজেই শিগ্‌গিরই এখানে এয়ার অ্যাটাক হবে। আমাদের এখন একটাই করার আছে, তা হলো সাময়িক উইথড্রয়াল এবং কনসোলিডেশন। খালেদের কথা শুনে প্রায় সবার মনেই বিস্ময়ের ঝড় বয়ে গেলো। যুদ্ধের জন্য সকলে প্রস্তুত, আর খালেদ বলছেন কি না এখন যুদ্ধ হবে না। একজন জেসিও উঠে কিছু বলার অনুমতি চেয়ে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বললো, 'স্যার, পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর এই জুলুম চালাইছে, মা-বোনদের ইজ্জত মারছে। আমরা ওদের অ্যাটাক করতে চাই—|' অনেকেই তার এ কথা সমর্থন করলো।

খালেদ মোশাররফ অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'সুবেদার সাহেব, আপনার জীবনটা এখন দেশের জন্য মূল্যবান, আপনি চাইলে মারা যেতে পারেন, কিন্তু তারপর দেশের কি হবে? অথচ আপনি বেঁচে থাকলে আরো দশটা জওয়ান তৈরি হবে। যুদ্ধে আপনাকে একদিন যেতে হবে, তবে আজ নয়।' খালেদ মোশাররফ আরো বললেন, 'পাকিস্তানিরা যে বিস্তআপ করেছে তাতে এখন ঢাকার উদ্দেশে মার্চ করা হবে আত্মহত্যার শামিল। আমাদেরকে এখন একটা অঞ্চল মুক্ত রাখতে হবে। লোকবল বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আপাতত গেরিলা ওয়ারফেয়ারের মাধ্যমে শত্রুদের ক্যাজুয়ালটি ঘটানোই হবে আমাদের লক্ষ্য। এর মধ্যে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে হবে। ট্রেনিংয়ের জন্য সিলেটের সীমান্ত অঞ্চলে জায়গাও দেখে এসেছি আমি।' খানিকটা হতোদ্যম হলেও মেজর খালেদের কথায় যুক্তি থাকায় তা মেনে নিলাম। অন্যরাও আর উচ্চবাচ্য করলো না।

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ

বিকেলের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ এবং এসডিপিও আমার সঙ্গে দেখা করে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তার কিছুক্ষণ পর এসেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলী আজম, লুৎফুল হাই সাচ্চু, মাহবুবুর রহমান, হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর ওসমান প্রমুখ। তাঁরাও আমাদের সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। তাঁরা সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। আমরাও এ ব্যাপারে একমত হলাম।

মিটিংয়ের পর কিছু ট্রুপস্‌ চলে যায় আশুগঞ্জ ব্রিজে অবস্থান নিতে। খালেদ মোশাররফের আলফা কোম্পানি দিয়ে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট মাহবুবকে পাঠানো হলো শায়েস্তাগঞ্জে। মাহবুব খোয়াই ব্রিজের দু'পাশে অবস্থান নেয়।

বিদ্রোহের খবর প্রচার

সিওর উপস্থিতিতে টুআইসি'র (2nd in Command) নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব থাকে না। এখন থেকে আমার মূল কাজ হলো বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা ট্রুপসের তদারকি এবং সমন্বয় সাধন করা। ২৭ মার্চ বিকেল থেকেই পুলিশ ও তিতাস গ্যাস অফিসের ওয়্যারলেস এবং টেলিফোন অফিসের অপারেটরদের সহায়তায় সারাদেশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চতুর্থ বেঙ্গলের বিদ্রোহ করার খবর ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হতে লাগলো। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে সবাইকে এখানে আসার আহ্বান জানালাম। বললাম, অন্য কেউ বিদ্রোহ করে থাকলে যেন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। স্থানীয় পুলিশ, ইপিআর, এসডিও, এসডিপিও এবং টেলিফোন অপারেটররা এই মেসেজ প্রচারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন। সন্ধ্যা নাগাদ ওয়াপদা এলাকা থেকে সরে গিয়ে শহরের উত্তরদিকে একটি গাছপালা-ঘেরা জায়গায় অবস্থান নিলাম আমরা। পাশেই ছিল একটি প্রাইমারি স্কুল। আমাদের সঙ্গে তখন একটা রাইফেল কোম্পানি, একটা হেড কোয়ার্টার কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার। এখন থেকে পুরোপুরি যুদ্ধাবস্থায় চলে গেলাম আমরা। বিমান আক্রমণের ভয়ে তাঁবু খাটিয়ে থাকা যাবে না। ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কারে অবস্থান নিয়েই রাত কাটাতে হবে। সে রাতে আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না।

শুরু হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ

ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের আগমন

২৮ মার্চ দুপুরের দিকে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন (এখন মেজর জেনারেল) একটা মোটর সাইকেলে করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে হাজির হলো। ২৭ মার্চ রাতে কোনোভাবে আমাদের বিদ্রোহের খবর পাওয়ার পর কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালায় সে। তারপর আশপাশের কোথাও থেকে একটা মোটর সাইকেল যোগাড় করে সোজা আমাদের কাছে চলে আসে। মাত্র সাতদিন আগে নবম ইস্ট বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার। বদলির সুবাদে ছুটিতে ছিল সে। এ কারণেই সিও-র সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া না এসে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টেই রয়ে যায় আইনউদ্দিন। সন্ধ্যায় তাকে অ্যান্ডারসন খালে পাঠানো কোম্পানিটির দায়িত্ব দেয়া হলো। সে বললো, আমি এখনই আবার কুমিল্লা যেতে চাই। কুমিল্লা গিয়ে বাঙালি সৈন্য ও অফিসারদেরকে সপরিবার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার কথা বলেই চলে আসবো। আইনউদ্দিন কিছুক্ষণের মধ্যে কুমিল্লার দিকে রওনা হয়ে গেলো। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি পৌঁছুতেই সে দেখতে পায়, বিশাল এক কনভয় এগিয়ে আসছে। তখন রাত হয়ে গেছে। বেশ ক'টা হেডলাইট গোনার পর মোটর সাইকেল ঘুরিয়ে আইনউদ্দিন সোজা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে ছুট দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছানোর পর সব শুনে তাকে অ্যান্ডারসন খালে অবস্থান নিতে বলা হলো। পরদিন দুপুরে পাক বাহিনীর কনভয়ের অগ্রবর্তী দুটো জিপ অ্যান্ডারসন খালের ব্রিজের মুখে পৌঁছুলে এপাশ থেকে আইনউদ্দিনের কোম্পানির অস্ত্রগুলো তাদের ওপর গর্জে ওঠে। আচমকা আক্রমণে একটা জিপ অচল হয়ে যায়, আরেকটা কোনো মতে পালায়। ঐ সংঘর্ষে একজন অফিসারসহ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। আইনউদ্দিনের আর ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া হলো না। এখন শত্রু-মিত্র স্পষ্টতই চিহ্নিত হয়ে গেছে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত অন্যান্য বাঙালি সেনাসদস্য ও সবার পরিবারের কথা ভেবে আমরা শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

ক্যান্টনমেন্টে যুদ্ধ

২৯ মার্চ বিকেলে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে চতুর্থ বেঙ্গলের রিয়ার হেড কোয়ার্টারের ওপর পাক আর্মি আর্টিলারি গান ও থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। আমাদের যেসব জওয়ান রিয়ারের দায়িত্বে ছিল তারা সংগঠিত হয়ে প্রবল বাধা দেয়। দু'পক্ষের মধ্যে প্রায় ছ'ঘন্টা ধরে যুদ্ধ চলে। রাত নেমে এলে পাকিস্তানিদের আক্রমণ কিছুটা স্তিমিত হয়। তখন কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওর নেতৃত্বে অধিকাংশ সৈন্য তাদের পরিবারসহ ক্যান্টনমেন্টের মরণফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। চতুর্থ বেঙ্গলের নায়েব সুবেদার এম.এ. সালাম এ সময় অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসা সৈনিকেরা অবশ্য তখুনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে নি। মে মাসের দিকে এদেরই একটা বড়ো অংশ বিবিরবাজার এলাকায় মাহবুবের সাব-সেক্টরের সঙ্গে যোগ দেয়। জাঙ্গালিয়া গ্রিড স্টেশনে আগে থেকেই অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের একটি প্লাটুনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। প্লাটুনটির কমান্ডার ছিলেন নায়েব সুবেদার এম.এ. জলিল।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল একত্র হলো

৩০ মার্চ টেলিফোন অপারেটরদের কাছ থেকে খবর পেলাম, মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বেঙ্গল ২৮/২৯ তারিখে জয়দেবপুরে বিদ্রোহ করে ময়মনসিংহে একত্র হয়েছে। আরো জানা গেলো, দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল ট্রেনে করে ঢাকা অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এ খবর পাওয়া মাত্র একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে মাহবুবকে কিশোরগঞ্জ পাঠানো হলো। তার সঙ্গে পাঠানো এক জরুরি বার্তায় খালেদ মোশাররফ মেজর শফিউল্লাহকে চতুর্থ বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এই মুহূর্তে ঢাকা গেলে তারা পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। আরো শক্তি সঞ্চয় করে সংগঠিত হয়ে তারপর ঢাকার দিকে এগোনোর প্রস্তাব করেন তিনি। ওদিকে আরেকটি ট্রেন ভৈরববাজার হয়ে নরসিংদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই ট্রেনটিতে দ্বিতীয় বেঙ্গলের যেসব সৈন্য ছিল তারা নরসিংদী এবং ডেমরার কাছে পাঁচদোনার বিভিন্ন জায়গায় পাক বাহিনীর ওপর এ্যামবুশ করে তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। দ্বিতীয় বেঙ্গলের এই যোদ্ধাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ইপিআর সদস্য। পাঁচদোনা এলাকায় দ্বিতীয় বেঙ্গলের যে ফোর্স গিয়েছিল তার কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (এখন মেজর জেনারেল)। সে তখন বালুচ রেজিমেন্টে কর্মরত ছিল। ছুটিতে থাকা অবস্থায় ২৯/৩০ মার্চ ময়মনসিংহে দ্বিতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেয় সে। যা হোক, ৩১ মার্চ নাগাদ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একত্র করা সম্ভব হয়। এই

রেজিমেন্ট দুটো ছিল প্রায় অক্ষত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গলের একত্র হওয়ার ব্যাপারটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরপরই মুক্তিযুদ্ধ একটি সুসংহত সামরিক শক্তি হিসেবে সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। নয় মাসের যুদ্ধের মূল স্তম্ভ ছিল এই ব্যাটালিয়ন দুটো। দখলদার পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পিত যুদ্ধাভিযান পরিচালনায় দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ব্যাটালিয়ন দুটি সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশবাসীর মনেও বিজয় সম্পর্কে আশার সঞ্চার করে।

তেলিয়াপাড়ার হেড কোয়ার্টার

দ্বিতীয় বেঙ্গল আসার পরই আমাদের বাহিনীর হেড কোয়ার্টার হবিগঞ্জের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে স্থানান্তরিত করা হয়। আশুগঞ্জ ও লালপুর ফেরিঘাটে অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলকে প্রত্যাহার করে তেলিয়াপাড়া চা বাগানে পাঠানো হয়। তাদের জায়গায় মোতায়েন করা হয় দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে। শায়েস্তাগঞ্জে অবস্থানরত লে. মাহবুবের (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল ও চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে নিহত) কোম্পানিকেও তেলিয়াপাড়া পাঠানো হয়। শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের দিকে পাঠানো হয় দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি। অর্থাৎ ১ এপ্রিলের পর আমাদের অবস্থান ছিল এরকমের : ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অ্যান্ডারসন খালে আইনউদ্দিনের কোম্পানি, শাহবাজপুর ব্রিজে হারুনের কোম্পানি এবং গঙ্গাসাগরে একটা প্লাটুন। গঙ্গাসাগরে প্লাটুনটি পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা ট্রেন লাইন ধরে আসতে গেলে তাদের প্রতিহত করা। অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য অর্থাৎ চতুর্থ বেঙ্গলের দু'কোম্পানির কিছু বেশি সৈন্য এবং দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি তেলিয়াপাড়াতে একত্র হলো। এরই মধ্যে একদিন চতুর্থ বেঙ্গলের সিও খালেদ মোশাররফ বিওপিগুলোতে (Border Outpost) অভিযান চালিয়ে বাঙালি ইপিআরদের মুক্ত এবং পাঞ্জাবিদের বন্দি করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখলের দায়িত্ব দিলেন মাহবুবকে। মাহবুব পরবর্তী প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে বিভিন্ন বিওপি থেকে কয়েকশো বাঙালি ইপিআরকে মুক্ত করে। এছাড়া বেশ কিছু পাঞ্জাবিকে বন্দি করে তাদের অস্ত্রগুলো নিয়ে আসে।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক

এপ্রিলের ২ তারিখে খালেদ আর আমার সঙ্গে তেলিয়াপাড়া সীমান্তের 'নো ম্যান্স্ ল্যান্ডে' ভারতের ত্রিপুরাস্থ বিএসএফ-এর আইজি (নাম মনে নেই) এবং আগরতলার ডিসি মি. সায়গলের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হলো। এসময় আমরা আমাদের কাছে আটক পাকিস্তানি অফিসার তিনজনের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা বন্দি তিনজনকে তাদের নিরাপত্তা

হেফাজতে রাখার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলাম। তারা কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানালেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিকেলে বন্দিদের গ্রহণের ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিলেন। তবে কাগজ-কলমে তাদের পরিচয় যুদ্ধবন্দির বদলে লেখা হলো অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। যেভাবেই হোক আমরা তাদের দায়িত্ব মাথার ওপর থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলাম। তাই ভারত তাদের নিতে রাজি হওয়ায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিপিও আমার কাছে এসে একরকম হাতজোড় করে বলেন, 'আমি আর এদের রাখতে পারছি না। লোকজন পাঞ্জাবিদের ওপর এমন ক্ষিপ্ত, যেখানেই পাঠাই কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়ে যায় এদের ছিনিয়ে নেয়ার জন্য। আমি তিন তিনটি থানা হাজতে বদলি করেছি বন্দিদের, সবখানে একই অবস্থা। আপনি আমাকে গুলি করুন, তবুও এদের নিয়ে যান।'

ওসমানী এলেন ঢাকা থেকে

২ এপ্রিলের পর কোনো এক সময় কর্নেল (অব.) ওসমানী ঢাকা থেকে পালিয়ে কুমিল্লার মতিনগর সীমান্ত পার হন। বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে তাঁকে আমাদের তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে নিয়ে আসেন। কর্নেল ওসমানীকে তো প্রথমে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর সুপরিচিত গোঁফ উধাও! প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বললেন না ওসমানী। কীভাবে গোঁফ কামিয়ে ছদ্মবেশে ঢাকা থেকে পালিয়ে এলেন, বারবার শুধু সে কথাই বলছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যদের গুলিতে তাঁর পোষা কুকুর মন্টির মৃত্যুতে খুব আফসোস করছিলেন কর্নেল ওসমানী। সেদিন একটা ছোটোখাটো মিটিং হয়। এ বৈঠকে আমরা ওসমানীকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের তাগিদ দিই, যাতে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম একটি বৈধতা অর্জন করে এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়। মিটিংয়ে বিএসএফ-এর ব্রিগেডিয়ার পান্ডে জানালেন, চট্টগ্রামে মেজর জিয়া প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষে রামগড়ে অবস্থান করছেন। তাঁর সেনাদল একেবারে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। পান্ডে বললেন, মেজর জিয়াকে আমাদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হবে। মিটিংয়ে জিয়াকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সে অনুযায়ী চতুর্থ ও দ্বিতীয় বেঙ্গলের দুটো শক্তিশালী কোম্পানি সে রাতেই তার সাহায্যার্থ পাঠানো হলো। কোম্পানি দুটো ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে রামগড় পৌঁছে মেজর জিয়ার অষ্টম বেঙ্গলের অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয়। পরে তারা ফেনী-চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজ এবং কুমিরা এলাকায় কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশ নেয়। জিয়াকে দেয়া চতুর্থ বেঙ্গলের কোম্পানিটির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন মতিন (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), দ্বিতীয় বেঙ্গলের কোম্পানির অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এজাজ (এখন মেজর জেনারেল)। এই মিটিংয়ে ওসমানী তাঁর এক

অবাস্তব পরিকল্পনার কথা উত্থাপন করেন। তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গলকে দিয়ে ভারতের সোনামুড়া সংলগ্ন গোমতি নদী পার হয়ে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের প্রস্তাব দিলেন। ওসমানী বললেন, কুমিল্লার দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ এবং দখল করতে হবে। পরিকল্পনাটা অবাস্তব ছিল এজন্যই যে, এতে আমাদের পক্ষে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হতো। ঐ মুহূর্তে সদ্য একত্র হওয়া দুটো ব্যাটালিয়নই আমাদের প্রধান সম্বল। ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করতে গেলে ব্যাটালিয়ন দুটোর অঙ্কুরেই বিধ্বস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ব্যাটালিয়ন দুটোর উর্ধ্বতন অফিসারদের প্রবল আপত্তির মুখে ওসমানীর এই অসাধ্য ও অবাস্তব প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

মৃত্যুর মুখোমুখি

৬ এপ্রিল প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম। সেদিন সকালে জিপ চালিয়ে তেলিয়াপাড়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আইনউদ্দিনের পজিশনে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে দ্বিতীয় বেঙ্গলের মেজর নুরুল ইসলাম, ড্রাইভার এবং আমাদের দু'জনের দুই ব্যাটম্যান। জিপের ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। গাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের প্রধান সড়কের রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছুতেই আকাশে জঙ্গি বিমানের শব্দ পেলাম, বাইরে মাথা বের করে তাকাতেই দেখি, দুটো এফ-৮৬ স্যাবর জেট ডাইভ দিয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে যে যেখানে পারলাম আশ্রয় নিলাম। আমি আর আমার ব্যাটম্যান পার্শ্ববর্তী নিয়াজ মোহাম্মদ কলেজের একটি কক্ষে ঢুকে পড়লাম। মেজর ইসলাম ঠাঁই নিলো পাশের কালভার্টের নিচে। তার ব্যাটম্যান ঢুকে গেলো লেভেল ক্রসিংয়ের পাশের ঘন্টি ঘরে। ড্রাইভার যে কোথায় গেলো, বুঝলাম না। এর পরের কিছুক্ষণ মনে হলো একটা দুঃস্বপ্ন দেখছি। টানা প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে আমাদের অবস্থানের ওপর চললো দুটো জঙ্গি বিমানের অনবরত স্ট্রাফিং। মেশিনগানের গুলি আর রকেটের প্রবল আওয়াজে কানে তালা লেগে যাওয়ার অবস্থা। তবে বেঁচে গেলাম মূলত রুমটার সামনেই একটু দূরে রেল লাইনের ওপর রেলের তিনটি মালবাহী ওয়াগনের জন্য। মেশিনগানের গুলি এবং রকেট আঘাত করে ঐ ওয়াগন তিনটিকে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায় সেগুলোতে। ওয়াগন তিনটি সেখানে না থাকলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ওয়াগন তিনটি আমার অবস্থানকে Line of fire থেকে আড়াল করে রেখেছিল। মিনিট পাঁচেক পর বিমানের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে ধীরে ধীরে সবাই যার যার অবস্থান থেকে বেরিয়ে এলাম। সবাইকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেল— একজনকে ছাড়া। অন্যরা বেরিয়ে এলেও মেজর ইসলামের ব্যাটম্যানকে দেখছিলাম না। হঠাৎ মনে পড়লো সে ঘন্টি ঘরে ঢুকেছিল। দ্রুত সবাই

সেখানে গিয়ে দেখলাম, মেশিনগানের গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে পড়ে আছে সে। তার বুকে, পেটে এবং উরুতে মেশিনগানের .৫০ গুলির তিনটি বিরাট গর্ত। গুলি লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। টিনের ঘণ্টি ঘরটা মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা। একজন সহযোদ্ধার মৃত্যু এবং আকস্মিক বিমান হামলায় সবাই মানসিকভাবে ভয়ানক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কয়েক মিনিটের বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সবাই হতবিহ্বল। আসলে ঐ মুহূর্তের অনুভূতি ঠিক লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। ঐ শেল শক পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে দিন পনেরো লেগে যায় আমার। সেদিনই বিকেলে রেডিওতে ঘোষণা করা হলো, পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর এফ-৮৬ জঙ্গি বিমানের ইন্টারসেপশনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিদ্রোহী কমান্ডার নিহত হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আছি একথা জানা থাকায় ঢাকায় আমার স্ত্রী ও পরিবারের সবাই দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়। সম্ভবত জিপে লাগানো ফ্ল্যাগ দেখে পাকিস্তানিরা ধরে নেয়, মুক্তিযোদ্ধাদের হোমরাচোমরা কেউ ঐ গাড়িতে ছিল।

ক্যাপ্টেন হায়দার এবং সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইমাম ও মাহবুব

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আরো তিনজন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা হলো ক্যাপ্টেন হায়দার (পরে লে. কর্নেল এবং শহীদ) সে. লে. ইমামুজ্জামান (এখন মেজর জেনারেল) এবং লে. মাহবুব (পরে ক্যাপ্টেন এবং সিলেটের এক যুদ্ধে শহীদ)। দু' একদিন আগে-পরে তারা তেলিয়াপাড়া ক্যাম্পে আসে। তিনজনই কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল। হায়দার ছিল থ্রি কমান্ডো ব্যাটালিয়নের অফিসার। ওই ব্যাটালিয়নে আরেকজন বাঙালি অফিসার ছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ক্যাপ্টেন হায়দার পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি হওয়ার আগেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে আসে। অন্য বাঙালি অফিসারটি পাকিস্তানিদের প্রতি আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ক্যান্টনমেন্টেই থেকে যায়। পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয় ঐ অফিসারটি। পাকিস্তানি সৈন্যদেরকে চট্টগ্রামের কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র দখল করতে সহায়তা করে সে। অফিসারটি এ সময় মেজর জিয়ার সেনাদলের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়। এই ঘটনার পরপরই সে পাকিস্তানে পোস্টিং নিয়ে চলে যায়। অবাক করার মত ঘটনা, জিয়া-পত্নীর শাসনকালে ঐ অফিসারটি তার মন্ত্রীসভায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

সে. লে. ইমামুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার ঘটনাটি ছিল লোমহর্ষক। সে ছিল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের আর্টিলারি রেজিমেন্টে। রেজিমেন্টটির সিও পাঞ্জাবি লে. কর্নেল ইয়াকুব ছিলেন চরম বাঙালি-বিদ্বেষী। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের বিদ্রোহ করার খবর পেয়ে রক্তলোলুপ ঐ অফিসার তার রেজিমেন্টের

বাঙালি সেনাসদস্যদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়। তার নির্দেশমতো বেশ কয়েকজন বাঙালি সেনাসদস্যকে একটি কক্ষে ঢুকিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালায়। লে. লে. ইমামুজ্জামানও এই বাঙালি সেনাসদস্যদের মধ্যে ছিল। গুলিবিদ্ধ হয়ে সবাই লুটিয়ে পড়ে। ইমামুজ্জামানের গায়ে গুলি লাগলেও তার মৃত্যু হয় নি। আহত অবস্থায় অন্যদের মৃতদেহের নিচে লুকিয়ে থাকে সে। পরে রাত নেমে এলে গোপনে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে আসে ইমামুজ্জামান। তারপর সীমান্ত পার হয়ে বিএসএফ-এর কাছে পরিচয় দিলে তারা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। একটু সুস্থ হলে সেখান থেকে তেলিয়াপাড়া চলে আসে ইমামুজ্জামান।

লে. মাহবুবের পোস্টিং ছিল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে। কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে ২৯ মার্চের পর পালিয়ে এসে তেলিয়াপাড়ায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মাহবুব। পরবর্তীকালে প্রথম বেঙ্গলে পোস্টিং হয় তার। নভেম্বরের শেষদিকে সিলেটের পূর্বাঞ্চলে এক রণাঙ্গনে শহীদ হয় মাহবুব।

আপসকামী নেতৃত্ব

বিমান হামলার দু'তিনদিন আগের ঘটনা। ডিফেন্স পজিশনগুলো তদারকির রুটিন কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার সময় সিলেট সড়কে সরাইলের কাছে হঠাৎ করে তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। রাস্তার পাশে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ছোটোখাটো একটা জনতা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের সঙ্গে আমার ছাত্রজীবনের পরিচয়। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন ঢাকা হল ছাত্র সংসদে ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেলে তিনি জিএস আর আমি সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ছিলাম। সত্তরের নির্বাচনে সংসদ নির্বাচিত হয়েছেন তাহের ঠাকুর। যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন সেটাই তার নির্বাচনী এলাকা। স্বভাবতই আমি গাড়ি থেকে নেমে সোৎসাহে তাকে ২৭ তারিখ আমার বিদ্রোহ করার কথা জানালাম। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা কি, জানতে চাইলাম তার কাছ থেকে। আমাকে হতবাক করে দিয়ে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর রীতিমতো খাপ্পা হয়ে গিয়ে বললেন, "I don't know anything. I have nothing to do with you. Who told you to revolt? We didn't ask you to do so...you people in uniform always complicate the situation." তাহের ঠাকুরের মনোভাব দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলাম আমি। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে চাকরির নিশ্চয়তার প্রলোভন, নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে দেশের জন্য নিরস্ত্র জনগণের জীবন রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, আর একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে এই লোক বলে কি না Who told you to revolt? তার সঙ্গে আর কোনো কথা বলার প্রবৃত্তি হলো না আমার। তক্ষুনি চলে এলাম সেখান থেকে।

স্ত্রী-পুত্রের খোঁজখবর

৩ বা ৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এলেন। জাকারিয়া চৌধুরীসহ (সাবেক মন্ত্রী) কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তার সঙ্গে ছিলেন। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। মওদুদ জানালেন, ঢাকা থেকে অনেক তরুণ যুদ্ধে যোগ দিতে চাইছে। তিনি আবার ঢাকায় ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবসহ আগ্রহীদেরকে নিয়ে আসতে চাইলেন। মওদুদ ঢাকায় যাবেন শুনে আমার স্ত্রী ও দু'ছেলে বিন্দু ও কোচন কোথায় কেমন আছে সে ব্যাপারে খোঁজ করতে বলায় সাগ্রহে রাজি হলেন তিনি। ঢাকা থেকে মওদুদ ফিরলেন ৮ এপ্রিল। এসে জানালেন, আমার স্ত্রী রাশিদা দু' ছেলেকে নিয়ে ঘোড়াশালে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। ঘোড়াশালে আমাদের একজন নিকটাত্মীয় থাকতেন, তবে আমার ধারণা, রাশিদার সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। মওদুদ বানিয়ে বলছেন কি না সন্দেহ হলো আমার। ঢাকা শহরে চলাফেরা তখন মোটেই নিরাপদ নয়। তাই হয়তো আমার পরিবারের খোঁজ করতে পারেন নি। এখন চক্ষুলজ্জায় না-ও করতে পারছেন না। হঠাৎ করেই মনে হলো, নরসিংদীতে রাশিদার এক আত্মীয়ের বাড়ি আছে। ঘোড়াশাল থেকে নরসিংদী কাছেই। তাহলে রাশিদা হয়তো নরসিংদীতেই আছেন। সেদিনই নরসিংদীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সন্ধ্যা পেরোতে চারজন জওয়ান আর ব্যাটম্যানকে নিয়ে রওনা হলাম। অনেক ঘোরাঘুরি করে নরসিংদীর ঐ বাড়িটিতে যখন পৌঁছুলাম, তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। ভয়ে কেউ দরজা পর্যন্ত খুলতে চায় না। শেষ পর্যন্ত জিগ্যেস করলাম, ঢাকা থেকে কেউ এসেছে কি না। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকেই জানানো হলো, না কেউ আসে নি ঢাকা থেকে। এতোটা পথ এসেও ওদের কোনো খবর না পেয়ে খুব হতাশ লাগলো। ফেরার সময় কাছেই নরসিংদী বাজারে দেখলাম আগুন জ্বলছে। প্রচুর গুলির শব্দও শোনা গেলো। বুঝলাম পাকসেনাদের কাজ। আমরা সংখ্যায় মাত্র পাঁচজন। তাই চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। পরদিন সকালের দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এসে পৌঁছুলাম।

এ সময় দ্বিতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি নিয়ে আশুগঞ্জের প্রতিরক্ষায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ক্যাপ্টেন নাসিম (পরে লে. জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান)। নরসিংদী যাওয়ার পথে আশুগঞ্জ পার হওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা হয় আমার।

৪ এপ্রিল পাক বিমানবাহিনী অ্যান্ডারসন খালে আমাদের অবস্থানে হামলা চালায়। এই হামলায় চতুর্থ বেঙ্গলের একজন জওয়ান শহীদ হয়। গুরুতর আহত হয় আরেকজন। বিমান হামলার পর অ্যান্ডারসন খালের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করা হয়।

তেলিয়াপাড়ায় গুরুত্বপূর্ণ কনফারেন্স

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে তেলিয়াপাড়া হেড কোয়ার্টারে একটি বড়ো ধরনের কনফারেন্স হলো। দ্বিতীয় ও চতুর্থ ব্যাটালিয়নের সিনিয়র অফিসাররা ছাড়াও এতে কর্নেল (অব.) ওসমানী, রামগড় থেকে আসা মেজর জিয়া, ভারতীয় বিএসএফ-এর প্রধান মি. রুস্তমজি, ব্রিগেডিয়ার পান্ডেসহ কয়েকজন সিনিয়র অফিসার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসডিও কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সহায়তা করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ ছিল নেহাতই অনুল্লেখ্য। এ কনফারেন্সেই আমরা সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলি মুক্তিযুদ্ধকে বৈধতাদানের জন্য এখনই একটি অস্থায়ী সরকার গঠন অত্যাবশ্যক। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য এটি অপরিহার্য ছিল। এরই ফলে ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হলো।

এদিকে কনফারেন্স চলাকালে একটা ঘটনা ঘটলো। সকাল সোয়া আটটা একজন সিগন্যাল জেসিও একটা মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করে আনলো। মেসেজটা হচ্ছে TOT (Time over Target) at 8.30। এর অর্থ বাংলাদেশের কোনো একটি জায়গায় সাড়ে আটটার সময় বিমান থেকে বোমা হামলা হবে। ওসমানী সাহেব এতে খানিকটা অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, যে-কোনো সময় পাকবাহিনী বিমান হামলা চালাতে পারে। চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। অথচ তেলিয়াপাড়া একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা এলাকা, সেখানে পাকিস্তানি বিমান হামলার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সীমান্তের অতো কাছে জঙ্গি বিমান পাঠানো মানে ভারতকে একরকম যুদ্ধের উস্কানি দেয়া, যেটা অন্তত ঐ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা চাইছিল না। ওসমানীর এই ভীরুতা দেখে বিদেশী অতিথিদের সামনে অনেকটা অপ্রস্তুতই হতে হয় আমাদের।

এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অ্যান্ডারসন খালের ডিফেন্স পর্যবেক্ষণে যেতাম আমি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা হতো। এরি মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটা ট্রেনিং কোম্পানি গঠন করা হয়েছিল। কোম্পানিটির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ডাক্তার লে. আখতারকে। পরে আখতারের ট্রেনিং কোম্পানিকে তেলিয়াপাড়ায় নিয়ে আসা হয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ট্রেনিং কোম্পানিতে আসা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা হাজারে উন্নীত হলো। এই বিপুলসংখ্যক লোককে সামাল দেয়া আখতারের জন্য বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো।

আশুগঞ্জ-ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাকবাহিনীর দখলে

১৩ এপ্রিল পাকবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া দখলের অভিযান শুরু করে। এ উদ্দেশ্যে তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আশুগঞ্জ আমাদের অবস্থানগুলোতে বিমান হামলা চালায়। হেলিকপ্টারে করে আশুগঞ্জে পাওয়ার স্টেশনের পেছনের মাঠে সৈন্য নামানো হয়। এছাড়া বেশ কিছু পদাতিক সৈন্য ভৈরববাজার-আশুগঞ্জ রেলওয়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়। সেই সঙ্গে মেঘনা নদী দিয়ে গানবোট এবং অ্যাসল্ট ক্র্যাফটের মাধ্যমেও সৈন্য সমাবেশ ঘটায় পাকিস্তানিরা। মেঘনা ব্রিজ পার হয়ে তারা জঙ্গি বিমানের ছত্রচ্ছায়ায় সারাদিন ধরে গোলাবর্ষণ করতে করতে অগ্রসর হয়। পাক সৈন্যদের কাভার দেয়ার জন্য ছ'টি এফ-৮৬ জঙ্গি বিমান হামলা শুরু করে। এর মধ্যে পালা করে দু'টি বিমান সারা দিনই আকাশে ছিল। জল-স্থল-আকাশপথের এই ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে আশুগঞ্জ ও লালপুরে নিয়োজিত দ্বিতীয় বেঙ্গলের সৈন্যরা তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসে। মেঘনা ব্রিজ ও আশুগঞ্জ সম্পূর্ণভাবে পাকসেনাদের দখলে চলে যায়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে মেঘনা ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য আমরা তাতে হাই-এক্সপ্লোসিভ স্থাপন করেছিলাম। একটি মাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গই নিচের দুটো স্প্যান উড়িয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু দেশের সম্পদের এত বড়ো একটা ক্ষতি করতে আমাদের কারুরই মন চাইছিল না। আর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েও আকাশ ও নৌ-পথে তাদের অগ্রাভিযান ঠেকানো যেতো না। ব্রিজটা দখল করার পর পাকসেনারা এই আয়োজন দেখে হতবাক হয়ে যায়। কেন আমরা পশ্চাদপসরণ করার সময়ও ব্রিজটি উড়িয়ে দিই নি, তা তারা ভেবে পায় নি।

১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল— এই তিনদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আমাদের অবস্থানে বেশ কয়েকবার বিমান হামলা হলো। পাকিস্তানিরা আশুগঞ্জে এরি মধ্যে এক ব্রিগেডের মতো সৈন্য জড়ো করেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে। ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যা নাগাদ অগ্রবর্তী পাক সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছলো। সে মুহূর্তে অ্যান্ডারসন খালে অবস্থানরত চতুর্থ বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিনের কোম্পানির সেখানে থাকা আর নিরাপদ রইলো না। কারণ পাকবাহিনী তাদের পেছন দিয়ে খুব কাছে চলে এসেছিল। আমি তখন অ্যান্ডারসন খালের অবস্থানে আইনউদ্দিনের সঙ্গে। কোম্পানিটিকে সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আখাউড়া রেললাইন ধরে আখাউড়ায় পিছিয়ে এলাম আমরা। আখাউড়া পৌঁছে তিতাস নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজের দু'পাশে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে মুখ করে ডিফেন্স তৈরি করলাম। তারিখটা ছিল ১৭ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পিছিয়ে আসার সময় আখাউড়ায় অবস্থিত তিতাস নদীর ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। কিন্তু টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে ব্রিজটি পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে তার

দুটো স্প্যান কাত হয়ে যায়। এতে করে অবশ্য ব্রিজটি যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদেরকে ঐ ব্রিজ পুরোপুরি ভেঙে আবার ঠিক করতে হয়েছিল। এতে তাদের যথেষ্ট সময় ব্যয় হয়।

তখন থেকে আমাদের মূল ঘাঁটি হলো আখাউড়া স্টেশন ও তার আশপাশের এলাকা। এ অবস্থান নিরাপদ রাখা এবং আইনউদ্দিনের অবস্থান জোরদার করার জন্য গঙ্গাসাগরে নদীর পাশে অবস্থান নিতে একটা শক্তিশালী প্লাটুন পাঠালাম। এতে করে কুমিল্লার দিক থেকে পাক সৈন্যরা হঠাৎ করে পেছন থেকে আইনউদ্দিনের ওপর চড়াও হতে পারবে না।

আখাউড়া-গঙ্গাসাগর-সিঙ্গারবিলের যুদ্ধ

২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল আখাউড়া ও গঙ্গাসাগর অঞ্চলে পাকবাহিনীর সঙ্গে আমাদের তুমুল যুদ্ধ হলো। সীমান্ত রেখা লঙ্ঘনের আশঙ্কায় পাকিস্তানিরা এবার আর বিমান ব্যবহার করে নি। পাকবাহিনী দূরপাল্লার কামানের অবিরাম গোলাবর্ষণ আর পদাতিক বাহিনী মারফত হামলা চালালো। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পাকবাহিনী আমাদের দুটো অবস্থানই দখলে নিয়ে নিলো। এ যুদ্ধে আমাদেরও যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। আমাদের পক্ষে দশ-বারোজন শহীদ এবং ২০ জনের মতো আহত হয়। এই লড়াইয়ের পর আইনউদ্দিনের কোম্পানি ও গঙ্গাসাগরে অবস্থানরত প্লাটুনটি প্রত্যাহার করে আমরা ত্রিপুরার আগরতলা শহরের দক্ষিণে মনতলার 'নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডে' ক্যাম্প স্থাপন করলাম। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এটাই আমাদের ফোর্সের প্রথম সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনা। আখাউড়া দখল করে পাকবাহিনীর একটা অংশ আখাউড়া-সিঙ্গারবিল-আজমপুর সড়ক ও সমান্তরাল রেললাইন ধরে অগ্রসর হয়। সিঙ্গারবিলে আমাদের চতুর্থ বেঙ্গলের আরেকটি অবস্থান ছিল। সেখানেও পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। টানা দু'দিন যুদ্ধের পর তৃতীয় দিন সিঙ্গারবিল পাকবাহিনীর দখলে চলে যায়। সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত গোলা প্রায়ই সীমান্তের ওপারে আগরতলা বিমানবন্দরে গিয়ে পড়ছিল। গোলাগুলিতে বিমানবন্দরের বেসামরিক যাত্রীরা হতাহত হতে পারে—এই আশঙ্কায় আগরতলার প্রশাসন সিঙ্গারবিল পজিশন থেকে আমাদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। এ কারণে সিঙ্গারবিলে অবস্থিত আমাদের সৈন্যরা পিছিয়ে গিয়ে মনতলা নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডে অবস্থান নেয়। সিঙ্গারবিলে অবস্থান নেয়া চতুর্থ বেঙ্গলের সেনাদলটিকে আমি ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে সরিয়ে এনে আইনউদ্দিনের কোম্পানির সঙ্গে একত্র করি।

বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল

ল্যান্স নায়েক মোস্তফা কামালের শাহাদাত বরণ আখাউড়া-গঙ্গাসাগর-সিঙ্গারবিল যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ল্যান্স নায়েক মোস্তফাই

পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত হন। মোস্তফা আমার অধীনস্থ একজন সিপাই ছিল। ভালো মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুদিন আগে অবৈতনিক ল্যান্স নায়েক হিসেবে পদোন্নতি হয় তার। অর্থাৎ ল্যান্স নায়েকের র‍্যাঙ্ক হলেও সে পেতো সিপাইয়ের বেতন। আখাউড়া-গঙ্গাসাগর যুদ্ধে সে গঙ্গাসাগর ফ্রন্টে একটা এলএমজি পজিশনে ছিলো। গঙ্গাসাগর যুদ্ধের আগের দিন তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। সেদিন জনশূন্য আখাউড়া স্টেশনে তাকে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখে আমি রেগে গেলাম। মোস্তফার কাঁধে একটা এলএমজি। তার অধীনে যে চারজন সিপাই তাদের কাছে শুধু একটা করে রাইফেল, অথচ সে জরুরি এলএমজিটা ফ্রন্ট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে ঘুরছে। ধমক দিয়ে মোস্তফাকে জিগ্যেস করলাম, এখানে কি করছো তুমি? মোস্তফা উত্তর দিলো, স্যার, গত দু'তিনদিন ধরে আমাদের কারোরই ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া হয় নি। খাবারের খুবই অভাব। তাই আমি এখানে এসেছি খাবারটাবার কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে। আমি ওকে বললাম, তুমি এক্ষুনি তোমার জায়গায় যাও, আমি দেখি কি করা যায়। মোস্তফা চলে গেলো। সেদিন রাতে এক বস্তা বিস্কুট যোগাড় করে গঙ্গাসাগরে মোস্তফাদের অবস্থানে পাঠালাম। গঙ্গাসাগরের যুদ্ধে ২৪ এপ্রিল ভোর রাতে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মোস্তফা শহীদ হয়। পাক সৈন্যদের একটি অংশ পেছন দিয়ে গিয়ে আমাদের সৈন্যদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলে। আমাদের তরফে সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। এক প্লাটুনের মতো। উপায়ান্তর না দেখে ল্যান্স নায়েক মোস্তফা এলএমজি দিয়ে কাভার দিতে দিতে সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলে। শুধু মোস্তফার অবিরাম এলএমজির বার্স্ট ফায়ারেই ২৫/৩০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়। এই ফাঁকে আমাদের অন্য যোদ্ধারা নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তারা দূর থেকে মোস্তফাকে কাভার দেয়ার জন্য গুলি ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু সে আর ফিরতে পারে নি। নিজের জীবন বিপন্ন করে পাকসেনাদের ওপর এলএমজি চালাতে চালাতে এক সময় সে শহীদ হয়। ল্যান্স নায়েক মোস্তফার অসীম সাহসিকতা আর চরম আত্মত্যাগের জন্য আমাদের বেশ কয়েকজন সৈন্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। এ যুদ্ধে মোস্তফা ছাড়াও আমাদের আরো তিন-চারজন সৈন্য শহীদ হয়। স্বাধীনতার পর অন্যান্যের সঙ্গে আমিও সর্বোচ্চ বীরদের তালিকায় মোস্তফার নাম সুপারিশ করি। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন সম্মানসূচক খেতাবে ভূষিত করেন।

যাই হোক, ২৫ এপ্রিল নাগাদ বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আমাদের আর কোনো অবস্থান রইলো না। সবগুলো অবস্থান থেকে পশ্চাদপসরণ করে আমরা আগরতলার পার্শ্ববর্তী মনতলায় অবস্থান নিলাম। তেলিয়াপাড়ায় আমাদের যে ট্রুপস্ ছিল সেখান থেকে একটা কোম্পানি ক্যাপ্টেন গাফফারের

নেতৃত্বে সীমান্তবর্তী শালদা নদী এলাকায় পাঠানো হলো। সিঙ্গারবিলে চতুর্থ বেঙ্গলের যে ট্রুপস্ ছিল আইনউদ্দিনের নেতৃত্বে তাদেরকে পাঠানো হয় মনতলায়।

মতিনগরে অবস্থান গ্রহণ

২৮ এপ্রিল মেজর খালেদ মোশাররফ আমাকে কসবার দক্ষিণে মতিনগরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। মতিনগর এলাকাটি উঁচু-নিচু টিলা আর ঘন জঙ্গলে ভর্তি। সেই জঙ্গল পরিষ্কার করে আমরা সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করলাম। কয়েকদিনের মধ্য চতুর্থ বেঙ্গলের সিগন্যাল প্লাটুন, মর্টার প্লাটুন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারসহ সবগুলো গাড়ি তেলিয়াপাড়া থেকে মতিনগরে চলে এলো। সেই থেকে মতিনগরই হয়ে উঠলো চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের মূল ঘাঁটি এবং প্রাণকেন্দ্র। মতিনগর আসার পরই আমরা একটা ট্রেনিং ক্যাম্প চালু করলাম। মূলত ঢাকা ও তার আশপাশের জেলাগুলো থেকে দলে দলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গ্রামের সাধারণ যুবকরা এসে এই ক্যাম্পে যোগ দিতে লাগলো। দিনকয়েকের মধ্যেই এদের সংখ্যা কয়েক হাজারে উন্নীত হলো। এতোগুলো লোকের থাকা-খাওয়া আর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে লাগলাম আমরা।

বানের পানিতে যেমন পলির সঙ্গে আসে কচুরিপানা, তেমনি মুক্তিপাগল তরুণ-যুবকদের ভিড়ে মিশে এলো পাকিস্তানিদের কিছু চরও। প্রশিক্ষণার্থীদের কেউ কেউ দুয়েক দিন পর না বলে চলে যেতো। আমার ধারণা, ওরা আমাদের অবস্থান, প্রস্তুতি, অস্ত্র ও লোকবল সম্পর্কে খবর পৌঁছে দিতো পাকিস্তানিদের কাছে।

এয়ার ফোর্সের অফিসারদের আগমন

এরি মধ্যে একদিন ধোপদুরস্ত পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোককে শনাক্ত করার জন্য বিএসএফ-এর লোকজন আমার কাছে নিয়ে এলো। ঐ সময় বিএসএফ বা অন্য কেউ কোনো সন্দেহভাজন লোককে শনাক্ত করার জন্য আমার বা খালেদ মোশাররফের কাছে নিয়ে আসতো। সুবেশধারী ভদ্রলোক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কাদের (পরবর্তীকালে স্কোয়াড্রন লিডার অব.) বলে নিজের পরিচয় দিলেন। কাদের জানালেন, তাকে ঢাকাস্থ বিমান বাহিনীর কয়েকজন সিনিয়র অফিসার পাঠিয়েছেন এখানে আসার পথ এবং ব্যবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য। তিনি এরি মধ্যে এলাকার পথঘাট দেখে নিয়েছেন। কাদের বললেন, আমাকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলে কয়েকজন বাঙালি অফিসারকে পাবেন আপনি, আর যদি না ছাড়েন তাহলে হয়তো তারা আর আসতে উৎসাহী হবেন না। দোটানায় পড়ে গেলাম। এর আগেও এয়ার

ফোর্সের পরিচয় দিয়ে একজন এসে দু'দিন পর চলে গেছে। এও যদি তাই করে? তবে তার কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই বুঝলাম, ভদ্রলোক প্রকৃতই বিমান বাহিনীর একজন অফিসার। তিনি যদি সত্যিই কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে আসেন, তাহলে তো খুবই ভালো হয়।

ফ্লা. লে. কাদেরকে ক্যাম্পে রেখে বিকেলে আগরতলায় খালেদ মোশাররফের কাছে পরামর্শ চাইতে গেলাম। সবকিছু শোনার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে মেজর খালেদ বললেন, 'আমাদের সম্পর্কে জানতে পাকিস্তানিদের আর কিছু বাকি আছে নাকি? বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা কতো, তাতো ওরা জানেই। দাও ছেড়ে, কি আর হবে!' খালেদ মোশাররফের কথায় ফ্লা. লে. কাদেরকে ছেড়ে দিলাম। এরপর কয়েকদিন বেশ টেনশনে ছিলাম। ক'দিন পরই মতিনগর ক্যাম্পে বেশ কিছু নারী-পুরুষ-শিশু-সম্বলিত এক 'কাফেলা' এসে হাজির হয়। এই কাফেলাটা ছিল এয়ার ফোর্সের সেই সব অফিসার এবং তাদের পরিবারবর্গের। আমি ঐ সময় ক্যাম্পে ছিলাম না। পরে ক্যাম্পে এসে তাদের দেখে যুগপৎ বিস্মিত এবং উৎফুল্ল হই। প্রথমে আসা ফ্লা. লে. কাদেরের সঙ্গে সেদিন এয়ার ফোর্সের যেসব অফিসার অবরুদ্ধ ঢাকা থেকে পালিয়ে আমাদের মতিনগর এসেছিলেন, তারা হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), উইং কমান্ডার বাশার (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল; কর্মরত অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সুলতান মাহমুদ (পরে এয়ার ভাইস্ মার্শাল, অব.), ফ্লা. লে. বদরুল আলম (পরে স্কোয়াড্রন লিডার, অব.), ফ্লা. লে. লিয়াকত আলী (পরে স্কোয়াড্রন লিডার, অব.), ফ্লা. লে. সদরুদ্দিন (পরে এয়ার ভাইস মার্শাল, অব.), স্কোয়াড্রন লিডার শামসুল আলম (পরে গ্রুপ ক্যাপ্টেন, অব.), ফ্লাইং অফিসার ইকবাল রশীদ (পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, অব.), ফ্লাইং অফিসার সালাউদ্দিন (পরে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, অব.) প্রমুখ। এরা আসায় আমাদের শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেলো। আমাদের বাহিনীতে অফিসারদের দলটাও একটু ভারি হলো, যা তখন খুব প্রয়োজন ছিল। এর দু'একদিন আগে-পরে ঢাকা থেকে সেনাবাহিনীর আরও চারজন ক্যাপ্টেন—আমিনুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.), জাফর ইমাম (পরে লে. কর্নেল অব.), সালেক (পরে মেজর সালেক, প্রয়াত) ও আকবর (পরে লে. কর্নেল অব.) আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

আবার পরিবারের খোঁজে

মে মাসের ৫/৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা কাজী আমাকে জানালো, সে ঢাকায় যাবে। আমি চাইলে সে আমার স্ত্রী-পুত্রদের তার সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। ওরা ঢাকা থেকে চলে এলে খুবই ভালো হয়,

কাজেই রাজি হয়ে গেলাম আমি। কাজীর কাছে রাশিদাকে একটা চিরকুট লিখে দিলাম, যাতে সে নিশ্চিন্তে চলে আসতে পারে। মনে আছে, একটা সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে তার উল্টোদিকের শাদা অংশে তিনটি শব্দ লিখেছিলাম শুধু—'তুমি চলে আসো'। কাজী ঢাকায় কয়েক দিন ছিল। এর মধ্যে খোঁজ করে জানতে পারে, রাশিদা পুরানা পল্টনে তার বোনের বাসায় আছে। চিঠিটা পাওয়ার পরদিনই ভোরবেলা কাজীর সঙ্গে রওনা হয়ে যান রাশিদা। কাইয়ুম নামে কাজীর এক বন্ধুও তাদের সঙ্গে চললো। কাইয়ুমের উদ্দেশ্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়া। নৌকা, বেবিট্যাক্সি, রিকশা এবং হাঁটাপথে মতিনগর পৌঁছুতে তাদের সন্ধ্যা হয়ে যায়। আমি তার ক'দিন আগে কোলকাতায় চলে গেছি। এদিকে কোলকাতায় যাওয়ার আগেই ঘটেছে আরেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আগরতলা যাওয়ার পথে সোনামুড়া ফেরি ঘাটে ঢাকা থেকে আসা বেশ কিছু তরুণ-যুবকের মধ্যে দেখি আমার ছোট ভাই রুবেল দাঁড়িয়ে। ওর বয়স তখন তেরো-চোদ্দ হবে। আমি মতিনগর আছি জানতে পেরে অন্যদের সঙ্গে সেও চলে এসেছে। ঐ পরিস্থিতিতে যেন অবাক হতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তাই রুবেলকে দেখে মোটেই আশ্চর্য হই নি। তখনকার মতো ওকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে আমি আমার কাজে চলে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণীর লোকজন আসছিল অব্যাহতভাবে। সেই সঙ্গে আমাদের বাহিনীর পুনর্গঠন ও ট্রেনিংয়ের কাজও চলতে থাকে যথাসাধ্য।

তৃতীয় বেঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ

কোলকাতা যাত্রা এবং প্রবাসী সরকার ও সিইনসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ

এপ্রিলের শেষদিকে আগরতলায় BDF (Bangladesh Force)-এর পূর্বাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়। ১০ মে বি ডি এফ হেড কোয়ার্টার থেকে আমার পোস্টিং অর্ডার হলো। পোস্টিং অর্ডারে কোলকাতাস্থ বিডিএফ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে C-in-C (কমান্ডার ইন চিফ) কর্নেল (অব.) ওসমানীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হলো। তিনিই আমাকে আমার পরবর্তী দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। ১৫ মে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে আগরতলা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের বিমানে করে কোলকাতার উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে যৎসামান্য টাকা। চতুর্থ বেঙ্গলের সৈনিকদের বেশির ভাগেরই বাড়ি ছিল কুমিল্লা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তারা তাদের নিজেদের এলাকায় থেকেই লড়াই করতে চাওয়ায় তাদের কাউকে সঙ্গে নিলাম না। আমার সঙ্গে এলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার। এসকর্ট হিসেবে সঙ্গে ছিল আরো তিনজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা—তান্না, শাহেদ ও তার আত্মীয় ইকবাল এবং ব্যাটম্যান ল্যান্স নায়েক মুজিব। কোলকাতায় পৌঁছে নিউ মার্কেট এলাকার একটা হোটেলে উঠলাম। পয়সার অভাবে এক বেডের একটা রুম ভাড়া করলাম। শাহেদরা কোলকাতায় আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে।

এদিকে কোলকাতাস্থ পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনার বাঙালি কর্মকর্তা হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ইতিমধ্যে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দপ্তরে ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলীর সঙ্গে কথাবার্তা হলো। তিনি পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে যুদ্ধের খবরাখবর জানতে চাইলেন। আমরা মোটামুটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছি জেনে আশ্বস্ত ও অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। আমাদের অগ্রগতির কথা শুনে বেশ আশাবাদী মনে হলো তাঁকে। ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসেই মুজিবের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি আর খন্দকার সাহেব উঠলাম গিয়ে হোটেলে। আগেই বলেছি, রুমে একটা মাত্র বিছানা ছিল। গ্রুপ ক্যাপ্টেন

খন্দকার পদ এবং বয়স দু'দিক থেকেই আমার বেশ সিনিয়র। কাজেই তাঁকে বিছানায় থাকতে বলে আমি ভূমিশয্যা নিলাম। মেঝেতে কার্পেট বা সেই জাতীয় কিছুই নেই, কিন্তু তারই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না ; কারণ এতোদিনে এসব অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পরদিন বাংলাদেশ দূতাবাসে গেলাম। সেখানকার লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম, সিইনসি কোথায় বসেন? কিন্তু সন্দেহবশত বোধহয় কেউ কিছুই বললো না। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয় কোথায় সেটাও জানাচ্ছিল না কেউ। এসময় কেউকেটা গোছের একজন ভদ্রলোককে খুব তৎপরতার সঙ্গে চলাফেরা করতে দেখলাম। আচার-আচরণে তাকে খুব চৌকশ দেখাচ্ছিল। সবাই তাকে খুব সমীহ করছে। জানা গেলো, তার নাম রহমত আলী। তার কাছে আমাদের পরিচয় দেয়ার পর তিনি জানালেন, তার আসল নাম আমীরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার)। তিনি আমাদেরকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ের ঠিকানা দিলেন। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার ও আমি ঠিকানা অনুযায়ী বালিগঞ্জের সেই অফিসে গেলাম। বাংলাদেশ সরকারের কার্যালয়ে পৌঁছে সিইনসি কর্নেল (অব.) ওসমানীর কাছে রিপোর্ট করলাম আমরা। ওসমানী সাহেব আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। বললেন, চলো বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের।

আমাদেরকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। সেখানে একটা চৌকির ওপর লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা অবস্থায় বসে ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আরো ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ এবং এম. মনসুর আলী। এএইচএম কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক তখন অফিসে ছিলেন না। কর্নেল ওসমানী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তিন স্থপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের। তিন নেতা দেশের পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধ কেমন চলছে, জানতে চাইলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের লোকবল, জনগণের মনোভাব, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল, কি কি প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। যুদ্ধ কতোদিন চলতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের ধারণাও জানতে চাইলেন তাঁরা।

কথাবার্তা শেষ হলে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে তাঁর কক্ষে গেলাম। ওসমানী আমাকে বললেন, চতুর্থ বেঙ্গলে দু'জন মেজর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এখন অফিসার সঙ্কটে ভুগছি। তাই আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্য জায়গায় পাঠানোর জন্য তোমাকে চতুর্থ বেঙ্গল থেকে ডেকে এনেছি। তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে আগামী তিনদিন আমার সঙ্গে থাকবে তুমি। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের বসিরহাট থেকে শুরু করে উত্তরে কুচবিহার পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করতে চাই আমি। তুমি আমার সাথে থাকবে। মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বাড়ানোর জন্য তাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবো আমি।

তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলোও সরেজমিনে জানা দরকার। কর্নেল ওসমানী আরো জানালেন, ফেরার পথে বালুরঘাটের কাছে বাঙালিপাড়া নামে একটা জায়গায় আমাকে নামিয়ে দেবেন তিনি। সেখানে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ড গ্রহণ করতে হবে আমাকে। ওসমানী আমাকে দায়িত্ব দেয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে পদ্মা নদীর উত্তরের সবগুলো ক্যাম্প থেকে ইপিআর, পুলিশ, মুজাহিদ, আনসার, ছাত্র-জনতা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন আনোয়ার (পরে মে. জেনারেল) তখন ১৮৭ জন সৈনিকসমেত তৃতীয় বেঙ্গলকে নিয়ে বাঙালিপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানকালে ৩০/৩১ মার্চ তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাকবাহিনী হামলা চালায়। আকস্মিক হামলায় তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের অনেকেই নিহত ও বন্দি হয় এবং অন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকা ও সামগ্রিক অবদান ছিল ঈর্ষণীয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বপালনের দুর্লভ সম্মানে আমি গর্বিত। প্রাণপ্রিয় এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কত্ব গ্রহণের পূর্বকালীন সময়ের (২৫ মার্চ—মে'র তৃতীয় সপ্তাহ) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমি পাঠকদের জন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

মার্চ মাসের ৪ তারিখে তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান ছিল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে। দিনটি ছিল ব্যাটালিয়নটির Raising Day বা প্রতিষ্ঠা দিবস। উল্লেখ্য, ১ মার্চ থেকে পাকবাহিনী বাংলাদেশের অন্যান্য সেনানিবাসের মতো এখানেও তৃতীয় বেঙ্গলকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা চালায়। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে ৪ মার্চ এক 'দরবার' অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ব্যাটালিয়নের সিও সব র‍্যাঙ্কের সদস্যদের উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। 'দরবার' চলার সময় অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও বিধিবহির্ভূতভাবে তৃতীয় বেঙ্গলের আবাসিক এলাকার চারপাশে ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট ও সশস্ত্র সেনাদল নিয়োগ করা হয়। এই ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাসদস্যের (এদের প্রায় সবাই বাঙালি) মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এরপর থেকে তৃতীয় বেঙ্গলের ব্যারাকগুলোর আশপাশে অস্ত্রধারী পাকসেনাদের গতিবিধি ক্রমশই বাড়তে থাকে। এর মধ্যে তারা তৃতীয় বেঙ্গলকে ঘিরে পরিখাও খোঁড়ে। পাকিস্তানিদের এসব ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম দেখে বাঙালি সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তৃতীয় বেঙ্গলের বাঙালি সেনাসদস্যরা আত্মরক্ষা ও প্রয়োজনে স্বজাতির মুক্তির জন্য লড়াইয়ের প্রত্যয় নিয়ে পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনায় বেশ কয়েকবার অননুমোদিতভাবে অস্ত্রধারণ করে

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

২৫ মার্চের আগে থেকেই বাংলাদেশে অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য সব ব্যাটালিয়নের মতো তৃতীয় বেঙ্গলের শক্তি কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া হয়। অজুহাত হিসেবে ভারতীয় আগ্রাসন ঠেকানোর মনগড়া কাহিনী শোনানো হয়। পাকবাহিনীর পাশবিক পরিকল্পনা কার্যকর করায় তৃতীয় বেঙ্গল যেন সংগঠিত হয়ে বাধা দিতে না পারে, সেজন্যই তাদেরকে এভাবে ছত্রখান করে দেয়া হয়। এর ফলে প্রয়োজনে পরবর্তীকালে শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করাতে সুবিধে হবে, এ ব্যাপারটাও পাকবাহিনীর বিবেচনায় ছিল। এই নীল-নকশা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আলফা কোম্পানিকে পার্বতীপুরে পাঠানো হয়। সঙ্গে যায় পাকিস্তানি মেজর (পরে নিহত) সৈয়দ সাফায়েত হুসেন। চার্লি কোম্পানিকে ক্যাপ্টেন আশরাফের (পরে মেজর জেনারেল) নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও পাঠানো হয়। পলাশবাড়ি/ঘোড়াঘাট এলাকায় অবস্থান নেয় ব্রাভো ও ডেল্টা কোম্পানি। এদের সঙ্গে পাঠানো হয় মেজর নিজামউদ্দিন (পরে নিহত), ক্যাপ্টেন মুখলেস (পরে লে. কর্নেল অব.) এবং লে. রফিককে (পরে বন্দি ও নিহত)।

সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিল উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর রিয়ার পার্টি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও হেড কোয়ার্টার কোম্পানির কিছু সেনা-সদস্য। ৩১ মার্চ পাকসেনাদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার দিন পর্যন্ত ক্যাপ্টেন আনোয়ার (পরে মেজর জেনারেল), লে. সিরাজ (পরে বন্দি ও নিহত) ও সুবেদার মেজর হারিস এদের সঙ্গে ক্যান্টনমেন্টে অবস্থান করছিলেন। সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে আরো ছিলেন সিও লে. কর্নেল ফজল করিম ও সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর আকতার। এই দু'জনই ছিলেন পাকিস্তানি। সিও ফজল করিম ছিলেন প্রবলভাবে বাঙালি-বিদ্বেষী।

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যার মাধ্যমে পাকবাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করার পর ঘোড়াঘাটে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সৈন্যরা ২৮ মার্চ পলাশবাড়িতে লে. রফিকের নেতৃত্বে একটি বড়ো ধরনের অ্যামবুশ স্থাপন করে। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল, বগুড়ার দিকে অগ্রসরমান ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিত আঘাত হেনে তাদেরকে নির্মূল করে দেয়া। ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের অভিজ্ঞ পাকিস্তানি লে. কর্নেল গোলাগুলি শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে অনভিজ্ঞ তরুণ লে. রফিককে যুদ্ধের বদলে আলোচনার মাধ্যমে সঙ্কট অবসানের আহ্বান জানান। সিংহহৃদয়ের অধিকারী এই তরুণ বাঙালি অফিসার সরল বিশ্বাসে পাকিস্তানি কর্নেলের কাছে যাওয়ামাত্রই পাকসেনারা তাকে জোর করে কর্নেলের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রংপুরের দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার মুখে দু'পক্ষের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে গুলি বিনিময় শুরু হয়ে যায়। প্রচণ্ড গোলাগুলির এক পর্যায়ে ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট

টিকতে না পেরে রংপুরের দিকে পালিয়ে যায়। তাদের পক্ষে অনেকে হতাহত হয়। রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন সৈন্য শহীদ, একজন অফিসার বন্দি এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। বন্দি অবস্থায় হতভাগ্য রফিককে পরে রংপুর সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। এই সংঘর্ষের পর শত্রু-মিত্র চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত হয়ে গেলো। সংঘর্ষের এই খবর সৈয়দপুর পৌঁছানো মাত্র সেখানে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদের মধ্যে উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়।

৩০ মার্চ তৃতীয় বেঙ্গলের ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুট্যান্ট সিরাজকে রংপুর ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে একটা কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্য পাঠানো হয়। তার সঙ্গে ১০/১২ জন সশস্ত্র প্রহরী ছিল। পাকিস্তানিরা পথে তাদেরকে বন্দি করে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সে রাতেই প্রায় সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দলটির মাত্র একজন সদস্য দৈবক্রমে বেঁচে যায়। পরে সে তৃতীয় বেঙ্গলের সঙ্গে আবার মিলিত হতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, তখন রংপুর ব্রিগেডের গুরুত্বপূর্ণ ব্রিগেড মেজর পদে আসীন ছিলেন একজন বাঙালি মেজর আমজাদ খান চৌধুরী। উল্লেখ, তিনি ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন এবং তারই নিয়োজিত সেনা দল বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের পাহারার দায়িত্বে ছিল। আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে এরা সেদিন ব্যর্থ হয়। সব সম্ভবের দেশ এই বাংলাদেশে তিনি পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

৩০ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তানি ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের আবাসিক অবস্থানগুলোতে কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে। সেখানকার একমাত্র বাঙালি অফিসার আনোয়ার ছিল কোয়ার্টার মাস্টার। আনোয়ার ও সুবেদার মেজর হারিস মিয়ার নেতৃত্বে সেনানিবাসে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্রুত সংগঠিত হয়ে এই আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে অমিত বিক্রমে রুখে দাঁড়ায়। পাকিস্তানি সৈন্যরা এক পর্যায়ে কামানের গোলাবর্ষণ থামিয়ে উত্তরদিক থেকে Assault line বানিয়ে হামলা চালায়। তৃতীয় বেঙ্গলের বীর সেনারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে এ হামলাও প্রতিরোধ করে। নিজেদের পক্ষে ব্যাপক হতাহত হওয়ায় এবং আক্রমণে খুব একটা সুবিধে করতে না পারায় পাকসেনারা তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর ২৫ এফএফ রেজিমেন্ট আবার কামানের গোলার ছত্রছায়ায় আক্রমণ চালায়। এবারের আক্রমণ আসে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এ পর্যায়ের প্রচণ্ড সংঘর্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে আক্রমণকারী পাকসেনা দল এক সময় পিছিয়ে যায়। ভোর হয়ে এলে লড়াই স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দিনের আলোয় রংপুর থেকে ট্যাঙ্ক আনিয়ে নতুন করে পাক হামলার আশঙ্কা দেখা দেয়। এদিকে আবার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের নির্দেশে মার্চের প্রথম সপ্তাহেই তৃতীয় বেঙ্গলের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী

কামানগুলো সামরিক মহড়ার নামে সুকৌশলে ব্যাটালিয়ন থেকে সরিয়ে দিনাজপুরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ অবস্থায় দিনের আলোয় ক্যান্টনমেন্ট থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছিল আত্মহত্যার শামিল। নিজেদের পক্ষে প্রচুর হতাহত এবং শত্রু পক্ষের ভারি অস্ত্র ও লোকবলের কারণে আনোয়ার তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদেরকে কৌশলগতভাবে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়।

তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদল বিক্ষিপ্তভাবে গুলি চালাতে চালাতে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পিছিয়ে আসে। একদল পাকিস্তানি কামানের আওতার বাইরে বদরগঞ্জে অবস্থান গ্রহণ করে। অন্য দলটি অবস্থান নেয় ফুলবাড়িয়ায়। ক্যান্টনমেন্টের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের প্রায় ২০ জন শহীদ এবং ৩০ থেকে ৩৫ জনের মতো সদস্য আহত হয়। এছাড়া কয়েকজন নিখোঁজ হয়েছিল। পাকসেনাদের পক্ষেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

এদিকে ক্যান্টনমেন্টের রিয়ার পার্টির ওপর হামলার খবর পেয়ে ঠাকুরগাঁও ও পার্বতীপুরে অবস্থানরত চার্লি ও আলফা কোম্পানি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে এপ্রিলের ২ তারিখে ফুলবাড়িতে একত্র হয়। ফুলবাড়িতে দিনাজপুর সেক্টরের ইপিআর (সাবেক)-এর বহু সদস্য বিদ্রোহ করে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এদিকে আলফা কোম্পানি ফুলবাড়ি চলে যাওয়ায় একদল পাকসেনা ও প্রচুর অস্ত্রধারী বিহারি-অবাঙালি পার্বতীপুর এলাকা দখল করে নেয়। ৪ এপ্রিল আলফা কোম্পানি পাক অবস্থানে আক্রমণ চালিয়ে পার্বতীপুর পুনর্দখল করে। এ আক্রমণে টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত পাকসেনা ও সশস্ত্র বিহারিরা সৈয়দপুর পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও কয়েকজন আহত হয়।

প্রায় একই সময় চার্লি কোম্পানি ভুষিরবন্দরের পাক অবস্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। চার্লি কোম্পানির আক্রমণের তীব্রতার কারণে পাকসেনাদের প্রথমবারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে হয়। এ যুদ্ধে চার্লি কোম্পানির বেশ কয়েকজন হতাহত হয়ে পড়লে আক্রমণ বন্ধ করে তারা এক পর্যায়ে পিছিয়ে আসে। চার্লি কোম্পানি এবার অবস্থান নেয় চরখাইয়ের কাছে খোলাহাটিতে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ প্রায় গোটা তৃতীয় বেঙ্গল চরখাই-খোলাহাটিতে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করে। খোলাহাটিতে স্থাপন করা হয় হেড কোয়ার্টার। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি যুদ্ধে হতাহতের কারণে ব্যাটালিয়নের সদস্য সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। বিচ্ছিন্ন হয়ে-যাওয়া কিছু সেনাসদস্য ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়ার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে থাকে। অফিসারদের মধ্যে একমাত্র আনোয়ার তখন ব্যাটালিয়নে। আশরাফ ও মুখলেস তখন নিখোঁজ এবং নিজামউদ্দিন শহীদ।

তৃতীয় বেঙ্গল খোলাহাটি থাকার সময় সম্ভবত ৯ এপ্রিল আনোয়ার রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণের উদ্দেশ্যে বদরগঞ্জে রেকি (পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান) করতে যায়। তার সঙ্গে ছিল মাত্র কয়েকজন প্রহরী। এ সময় ভুল করে হঠাৎ সে জিপসহ ২৫ এফএফ রেজিমেন্টের সেনাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পাকিস্তানি এফএফ রেজিমেন্ট আর ইপিআর বাহিনীর চামড়ার সরঞ্জামাদি (Web Equipment) দুটোই কালো রঙের ছিল বলে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। মুহূর্তের মধ্যে দু'পক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। শুরু হয়ে যায় গুলি বিনিময়। মাত্র কয়েকজন যোদ্ধাসহ আনোয়ার বন্দি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে মরণপণ যুদ্ধ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে আনোয়ার গুলিবিদ্ধ হয়। পরে কৌশলে পাকিস্তানিদের ঐ শক্তিশালী অবস্থান অতিক্রম করে আনোয়ার ও তার সহযোদ্ধারা সেদিনই খোলাহাটিতে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলে ফিরে আসে। তবে ঐ এলাকার ম্যাপসহ জিপগাড়িটি শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে যায়। ম্যাপটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের বিভিন্ন কোম্পানির অবস্থান চিহ্নিত ছিল বলে বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় সেদিনই তৃতীয় বেঙ্গলকে দুই ভাগে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক অংশ চলে যায় চরখাই-ফুলবাড়ি এলাকায়, অন্য অংশ অবস্থান নেয় হিলি এলাকায়। উল্লেখ্য, এই ঘটনার দিন দুয়েক আগে আলফা কোম্পানি বদরগঞ্জে একটি বড়ো ধরনের অ্যামবুশ করে, যাতে পাকসেনাদের বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

এপ্রিলের ১৩ থেকে ১৪ তারিখে চরখাইয়ে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদল ও ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যরা রেল লাইন ধরে অগ্রসরমান শত্রুসেনাদের বড়ো দলের মোকাবেলায় ব্যাপক আকারের অ্যামবুশ স্থাপন করে। পাকসেনারা রেল লাইন ধরে হিলির উদ্দেশে যাচ্ছিল। রেল লাইনের দু'পাশের গ্রামগুলোতে আগুন লাগাতে লাগাতে অগ্রসর হচ্ছিল তারা। অ্যামবুশের ফাঁদে আসামাত্র পাকসেনারা প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু পাকসেনা হতাহত হলে আত্মরক্ষার জন্য তারা পার্বতীপুরের দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীরও কয়েকজন হতাহত হয়।

১৪ এপ্রিল আলফা কোম্পানির প্লাটুন কমান্ডার নায়েব সুবেদার (পরে ক্যাপ্টেন অব.) ওহাবকে ঘোড়াঘাট-হিলি রোডে পাকসেনাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে রেইড করতে পাঠানো হয়। অগ্রসরমান এই সেনাদলটির অলক্ষ্যে পাঁচবিবি-হিলি রোড ধরে আসা আরেকটি শক্তিশালী শত্রু-সেনাদল অতর্কিতে তাদেরকে পেছন দিক থেকে হামলা করে বসে। তৃতীয় বেঙ্গলের সামনের এবং একটু কোনাকুনিভাবে পেছনের শত্রু-অবস্থান থেকে অবিরাম মেশিনগান আর মর্টার ফায়ার হতে থাকে। একমাত্র রাস্তা ছাড়া কভার নেয়ার জন্য কোনো উঁচু আড়াল নেই। রাস্তার দু'পাশে বিস্তৃত ধানখেত। ঐ অবস্থানে সারাদিন

যুদ্ধের পর রাতের অন্ধকারে ওহাবের প্লাটুনটি পশ্চাদপসরণ করতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে তৃতীয় বেঙ্গলের একজন শহীদ ও ১৩জন আহত হয়। ওহাব আহতদের সবাইকে তাদের মূল প্রতিরক্ষা অবস্থানে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আলফা ও চার্লি কোম্পানির যৌথ সেনাদল মোহনপুর ব্রিজ এলাকার শত্রু অবস্থানে আক্রমণ করে। এ হামলায় দু'পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। তৃতীয় বেঙ্গলের দু'জন এনসিও নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। এই অভিযানের দু'একদিন পর আলফা কোম্পানি দিনাজপুরের রামসাগর এলাকায় পাক অবস্থানে রেইড করে এবং সাফল্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ফিরে আসে।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তৃতীয় বেঙ্গল মিত্র বাহিনীর পরামর্শমতো আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ এড়িয়ে গিয়ে রেইড, অ্যামবুশ, রোড মাইন স্থাপন ও ব্রিজ ডেমোলিশনের মতো কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে থাকে। উদ্দেশ্য, শত্রুপক্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে তাদের মনোবলে চিড় ধরানো এবং যাতায়াত বাধাগ্রস্ত করা। এ রকমই একটা অ্যাকশনে মে মাসের মাঝামাঝি পাঁচবিবি-জয়পুরহাট রাস্তার ওপর এক মাইন বিস্ফোরণে পাকবাহিনীর একটি গাড়ি বিধ্বস্ত হলে একজন অফিসার ও ১৩জন সৈন্য নিহত হয়।

চরখাই থাকাকালীন এপ্রিলের শেষে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে তৃতীয় বেঙ্গলের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বেঙ্গলে তখন রয়েছে একজন অফিসারসহ বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের ৪১৬ জন সেনাসদস্য। পরবর্তীকালে মিত্র বাহিনীর পরামর্শে দুটো কোম্পানি স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা রায়গঞ্জে। আনোয়ারের দুই কোম্পানি হিলি-বালুরঘাট এলাকায় থেকে যায়। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আনোয়ারের কোম্পানি দুটোর অধিনায়কত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আমি বালুরঘাটের কামারপাড়া নামের একটা জায়গায় তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে হাত দিই।

কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে সীমান্ত ক্যাম্প পরিদর্শন

বালিগঞ্জে লে. নূরুন্নবীর (পরে লে. কর্নেল, অভ্যুত্থানের অভিযোগে বরখাস্ত) সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোলকাতায় নূরুন্নবী যেখানে অবস্থান করছিলো, আমাকে সেখানে থাকার আমন্ত্রণ জানায়। সে তখন ক্যাপ্টেন ডালিম (পরে মেজর, অব.), ক্যাপ্টেন নূর (পরে মেজর, অব.) ও ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান (পরে কর্নেল এবং ১৯৮১-র চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে নিহত) এদের সঙ্গে সম্ভবত একটা স্কুলে ঠাঁই নিয়েছিল। একদিন নূরুন্নবীদের ওখানে গেলাম। ক্যাপ্টেন ডালিম, নূর, মতি এরা সবাই ক'দিন আগে পাঞ্জাব সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছে। সারা রাত গল্পগুজব হলো। তারা পাকিস্তান থেকে তাদের পালিয়ে আসার কাহিনী শোনালো। খুব খুশি হলাম। আরো তিনজন

অফিসারকে পাওয়া গেলো। নবী এ সময় আমাকে অনুরোধ করলো তাকে সঙ্গে নিতে। নিয়ে নিলাম তাকে। সঙ্গে আরো তিনজন। কর্নেল ওসমানী, ড্রাইভার ও আমার ব্যাটম্যান। শুরু হলো প্রায় আড়াইশো মাইলের যাত্রা। পথে বেশ কয়েকটি ক্যাম্পে থামলাম আমরা। ওসমানী সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ওসমানীকে এ সময় বেশ অসহিষ্ণু মনে হতে লাগলো। কোনো বড়ো ধরনের সমস্যা দেখলেই তিনি শুধু বলছিলেন, 'আমার পক্ষে এতো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আই উইল রিজাইন।' পুরো সফরে তিনি প্রায় কুড়িবার পদত্যাগের হুমকি দিলেন। প্রায় সব ক'টি ক্যাম্পের কমান্ডার এবং কোনো কোনো জায়গায় স্থানীয় সাংসদদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করলেন ওসমানী। বসিরহাটের কাছে একটি ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন জলিলের (পরে মেজর অব., জাসদ নেতা) সঙ্গে দেখা হয়। ওসমানী জলিলকে রীতিমতো অশালীনভাবে তিরস্কার করলেন। তাঁর এহেন আচরণ আমাকে লজ্জিত না করে পারলো না। জলিলের অপরাধ ছিল, বরিশালে পাকবাহিনীর আচমকা হামলায় বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ তার একটি লঞ্চ ডুবে যায়। ক্যাপ্টেন জলিল চুপচাপ ওসমানীর বকাঝকা মাথা পেতে নিলো। আমার তখন যুদ্ধক্ষেত্র আর কোলকাতার নিরাপদ জীবনের ফারাকটা বেশি করে মনে পড়ছিলো। মনে হলো, ওসমানী সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে হয়তো জলিলকে এভাবে দোষারোপ এবং তিরস্কার করতে পারতেন না।

বনগাঁ ক্যাম্পে দেখা হলো প্রথম বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হাফিজউদ্দিনের (পরে মেজর অব.) সঙ্গে। সব র‍্যাঙ্ক মিলিয়ে প্রায় দুশো সেনাসদস্যকে নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিল সে। প্রসঙ্গত বলতে হয়, প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল যশোর সেনানিবাসে। ২৫ মার্চের আগে থেকেই ট্রেনিংয়ের কারণে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ছিল ব্যাটালিয়নটি। ৩০ মার্চ তাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রথম বেঙ্গল সেই মতো ফিরে এলে পাকিস্তানিরা পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে অস্ত্র সমর্পণ করানোর চেষ্টা করে। প্রথম বেঙ্গলের বাঙালি সিও অস্ত্র সমর্পণের জন্য তৈরি হয়ে যান। ঐ পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে জেসিও-এনসিওরা বিদ্রোহ করে এবং যুদ্ধ করে অস্ত্রসহ বেরিয়ে আসে। তারপর ঐ শ'দুয়েক সৈনিক ছোট ছোট প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতে বনগাঁ সীমান্তে একত্র হয় এবং নো ম্যানস্ ল্যান্ডে ক্যাম্প স্থাপন করে। আশপাশের বিওপিগুলো থেকে বেশ কিছু বাঙালি ইপিআর তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যশোর সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গল বিদ্রোহ করার পর বাঙালি সিওসহ অনেকে আত্মসমর্পণ করে, কেউ পালিয়ে যায়। এছাড়া যুদ্ধে বেশ কয়েকজন বাঙালি সৈন্য হতাহত হয়।

যাই হোক, ক্রমশ আরো উত্তরে এগোলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত এসে

পৌঁছলাম বাগডোগরা এয়ারফিল্ডে। এয়ারফিল্ডের কাছাকাছি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে আওয়ামী লীগের সাংসদ সিরাজ সাহেবের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করলেন কর্নেল ওসমানী। এক পর্যায়ে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হলে অতি কষ্টে আমি সেটা সামাল দিলাম। কমান্ডার ইন চিফ কর্নেল ওসমানীর এহেন কার্যকলাপ ও আচরণে অত্যন্ত নিরাশ হলাম আমি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ জাগলো। স্থিরতাহীন মানসিকভাবে অশান্ত একজন লোককে মুক্তিবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে বসানো কতোটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে, এরকম প্রশ্ন জাগলো মনে। তিনদিনের এই সফরে মুক্তিযুদ্ধ, অপারেশন, যুদ্ধকৌশল, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের সংস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি ওসমানী। দেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইনের ক্ষেত্রে MPML (Manual of Pak Millitary Law) কতোটুকু গ্রহণযোগ্য আর কতোটুকু তার বাদ দেয়া উচিত, সারা পথ সেই আলোচনাতেই মেতে রইলেন তিনি। যুদ্ধের কেবল শুরু, বিজয় কতো দূরে রয়েছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, অথচ সেনাবাহিনীর আইন নিয়ে এখনি চিন্তার অন্ত নেই তাঁর! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ভারতের মতো নিরাপদ জায়গাতেও পাকিস্তানি কমান্ডো হামলার ভয়ে সারাক্ষণ আতঙ্কিত হয়ে রইলেন তিনি।

তৃতীয় বেঙ্গলের অধিনায়কত্ব লাভ ও পরিবারের সঙ্গে দেখা

ভুরুঙ্গামারীতে জয়মনিরহাট ক্যাম্পে দেখা হয় ক্যাপ্টেন নজরুলের (পরে লে. কর্নেল অব.) সঙ্গে। এবার ফেরার পালা। ফিরতি পথে বালুরঘাটের খাঙালপাড়ায় গাড়ি থামালাম। সেখানে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ১৮৭ জন সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সিইনসি ওসমানী আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাসদস্যদের উদ্দেশে 'দরবার' করে ব্যাটালিয়নটির অধিনায়কত্ব আমার ওপর অর্পণ করলেন। এরপর তিনি বালুরঘাট থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিমানযোগে কোলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

দিন দুয়েক পর খবর পেলাম, আমার স্ত্রী ও দুই ছেলে কাজীর সঙ্গে মতিনগর ক্যাম্পে পৌঁছানোর পর সেখানে একরাত থেকে আগরতলা চলে গেছে। সেখানে ওরা মেজর খালেদ মোশাররফের পরিবারের সঙ্গে কোনো একটা সরকারি কোয়ার্টারে রয়েছে। এ খবর পাওয়ার পর তিনদিনের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় গেলাম। সেখান থেকে বেসামরিক বিমানে করে আগরতলায় গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হলাম। পরদিনই আবার ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের একটা 'ফেয়ার চাইল্ড' পরিবহন বিমানে করে সপরিবারে কোলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করি। একই প্লেনে ছিলেন জোহরা তাজউদ্দিন ও তোফায়েল আহমেদ। তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে পরিচয় হলো। বাগডোগরাতে যাত্রাবিরতির সময় প্রায় দু'ঘণ্টার আলাপে ঘনিষ্ঠতা আরো

বাড়লো। তার নেতৃসুলভ আচরণে মুগ্ধ হই আমি। ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খাঁ শহরে থাকাকালে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে তোফায়েল আহমেদের উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ছিলাম। এ.আর.এস. দোহার সম্পাদনায় রাওয়ালপিন্ডি থেকে প্রকাশিত 'ইস্টার উইং' পত্রিকাটি বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাসহ তোফায়েল আহমেদের সংগ্রামী ভূমিকা ভালোভাবেই তুলে ধরতো। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নায়কের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগছিলো। কোলকাতায় পৌঁছে রাশিদা ও দু'ছেলেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার স্পিকার মনসুর হাবিবুল্লার বাসায় রাখলাম। ওঁর সঙ্গে রাশিদার আত্মীয়তা ছিল। তারপর সেখান থেকে সরাসরি বালুরঘাটে চলে গেলাম।

তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠন ও কয়েকটি অপারেশন

বালুরঘাট পৌঁছানোর পরবর্তী তিন সপ্তাহ তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হলো। শিলিগুড়ি থেকে মালদহ পর্যন্ত প্রতিটি ক্যাম্প থেকে শত শত ইপিআর, পুলিশ আর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে এগারোশো সদস্যের তৃতীয় বেঙ্গল গড়ে তুললাম। এই রিক্রুটমেন্টে ডা. মেজর এমএইচ চৌধুরী (পরে ব্রিগেডিয়ার) আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি আগে থেকেই বাঙালপাড়ায় অবস্থান করছিলেন। ট্রেনিংয়ের সঙ্গে কিছু কিছু প্র্যাকটিকাল ওয়ার্কও করানো হলো। দিনাজপুর, হিলি ও নওগাঁতে বিভিন্ন পাক অবস্থানে প্লাটুন পর্যায়ের প্যাট্রলিং এবং রেইড চালানো হয়। এসব অভিযানে লে. নবী, লে. (অব.) ইদ্রিস এরা যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দেয়। বেশ ক'টি অভিযানে তারা পাকবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার যুদ্ধে আহত হওয়ায় ক্যাম্পে থেকেই পুনর্গঠন কাজে ব্যস্ত ছিল। লে. (অব.) ইদ্রিস ছিল পাক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুক্তিযুদ্ধের আগে কর্মরত ছিল উত্তরবঙ্গের একটি চিনিকলে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ব-প্রণোদিত হয়ে যুদ্ধে যোগ দেয় ইদ্রিস। বাঙালপাড়া ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধা ও ইপিআর-দের সঙ্গে বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অংশ নেয় সে। বাঙালপাড়ায় এসে তৃতীয় বেঙ্গলের দায়িত্ব নেয়ার পর এই অফিসারটির বীরত্বের কথা শুনে তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানাই। আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সানন্দে তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দিল লে. ইদ্রিস। পরবর্তীকালে সে নবীর সঙ্গে দিনাজপুর শহর এলাকায় বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে। জুনের মাঝামাঝি আমরা যখন বালুরঘাট ছেড়ে মেঘালয়ের সীমান্ত এলাকায় চলে যাই তখন যাওয়ার সময় ইদ্রিস তাকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। বালুরঘাটে থেকেই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে সে। আমি আর তাকে ধরে রাখি নি। পরে শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের বাকি

সময়টাতেও সে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা-বিরোধীরা ইদ্রিসের ওপর দু'বার হামলা চালায়। প্রথমদফায় বেধড়ক মারধোর করার পর গুরুতর আহত ইদ্রিসকে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। কিন্তু কপাল জোরে সেবারের মতো বেঁচে যায় সে। দ্বিতীয়বার যাতে প্রচেষ্টা ব্যর্থ না হয় সেটা নিশ্চিত করতে ঘাতকরা ইদ্রিসকে গুলি করে হত্যা করে।

এ সময় ডা. মেজর এম. এইচ. চৌধুরী নামে একজন অফিসার বালুরঘাট এলাকার একটি ক্যাম্পে অবস্থান করছিলেন। তাকে আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানালে সোৎসাহে রাজি হলেন। এরপর থেকে সীমান্ত এলাকার ক্যাম্পগুলো পুনর্গঠনের সময় তিনি আমার সঙ্গে থাকতেন। পরবর্তীকালে তেলঢালায় যাওয়ার সময়ও মেজর চৌধুরীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। তেলঢালা ক্যাম্পে পৌঁছে সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তিনি বালুরঘাটে ফিরে যেতে চাইলেন। মেজর চৌধুরী বললেন, তার পরিবার বালুরঘাট এলাকায় রয়েছে। এছাড়া ঐ এলাকার ক্যাম্পগুলোর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার দায়িত্বে থাকতে পারেন তিনি। তাকে আর আটকে রাখলাম না। ডা. মেজর চৌধুরী বালুরঘাট চলে গেলেন। তার জায়গায় মহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্প থেকে এলো ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদ।

গারো পাহাড়ের তেলঢালায়

১৭ জুন পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ রেল জংশন থেকে দুটো বিশেষ ট্রেনে করে তৃতীয় বেঙ্গলের পরবর্তী গন্তব্য মেঘালয়ের তেলঢালার উদ্দেশে রওনা হলাম। তেলঢালার ভৌগোলিক অবস্থান ময়মনসিংহের উত্তর-পশ্চিমে গারো পাহাড়ের পাদদেশে। দু'দিন পর গৌহাটি রেলস্টেশনে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে ৭০ থেকে ৭২টি বেসামরিক ট্রাকে করে আরো একদিন চলার পর ব্রহ্মপুত্র নদী বরাবর মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তেলঢালায় পৌঁছুলাম। জায়গাটা গৌহাটি থেকে দুশো মাইল পশ্চিমে। ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গলে ভর্তি এলাকাটি সাপ, বুনো শুয়োর আর বাঘের আখড়া। এখন থেকে এটাই আমাদের ঘাঁটি। কয়েকটি পাহাড় পরিষ্কার করে কোম্পানিগুলোর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। আগে থেকেই জেড ফোর্সের অধিনায়ক মেজর জিয়া তার হেড কোয়ার্টার নিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। জিয়ার সঙ্গে ছিল জেড ফোর্সের ব্রিগেড মেজর ক্যাপ্টেন অলি আহমদ (পরে কর্নেল অব.) এবং ডি.কিউ. ক্যাপ্টেন সাদেক (এখন ব্রিগেডিয়ার)। জেড ফোর্সের অন্য একটি ব্যাটালিয়ন প্রথম বেঙ্গল ক্যাপ্টেন হাফিজের নেতৃত্বে বনগাঁ থেকে এসে পৌঁছুলো। দিন দশেক পর জেড ফোর্সের তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অষ্টম বেঙ্গল ক্যাপ্টেন আমিনুল হকের (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) নেতৃত্বে চট্টগ্রামের রামগড়

পাহাড় থেকে দীর্ঘ ভারতীয় ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে তেলঢালায় আমাদের পাশাপাশি অবস্থান নেয়। ২৫ জুন নাগাদ জেড ফোর্স বাংলাদেশের প্রথম পদাতিক ব্রিগেড হিসেবে সংগঠিত হয়। তিনটি ব্যাটালিয়নের যার যার অবস্থানে ট্রেনিং চলতে থাকে। একটি পদাতিক বাহিনীর যেসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ থাকা দরকার, তার সবই জেড ফোর্সের কাছে ছিলো। ছিলো না কেবল যোগাযোগের উপকরণ আর ম্যাপ। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো সিগন্যাল সেট বা ম্যাপ দেয় নি। হয়তো তাদের ওপর আমাদের নির্ভরশীল করে রাখার উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের তিনটি ব্যাটালিয়নের আলাদা আলাদা সাঙ্কেতিক নাম দিয়েছিল। তাদের নথিপত্রে আমাদের পরিচিতি ছিলো 1 Arty (প্রথম বেঙ্গল), 2 Arty (তৃতীয় বেঙ্গল) এবং 3 Arty (অষ্টম বেঙ্গল)। ২৮ জুলাই পর্যন্ত তেলঢালায় সর্বাত্মক যুদ্ধের ট্রেনিং চলতে থাকে। প্রায় সারাদিন ট্রেনিং চলে। রাতে প্রচণ্ড মশার কামড় আর শুয়োর, সাপ ইত্যাদির উৎপাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো আমাদের। বাংলাদেশের ভেতরে ঢোকার জন্য মনে মনে সবাই অস্থির হয়ে উঠছিলাম।

স্বদেশের মাটিতে যুদ্ধ

স্বদেশের মাটিতে মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষা

তেলঢালায় প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হলো ২৮ জুলাই। জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়া সেদিন তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের উদ্দেশে বললেন, 'আগামী দু'এক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা। শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে আমাদের। আমি আশা করি তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যরা শত্রু হননে তাদের প্রশিক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ দেখাবে। আমাদের লক্ষ্য হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশকে স্বাধীন করা। আমার বিশ্বাস জেড ফোর্সের প্রতিটি সদস্য এ লক্ষ্যে তাদের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। জয় বাংলা।'

সেদিনই বিকেলে আমাদেরকে অপারেশনের নির্দেশ দেয়া হলো। নির্দেশে বলা হলো, প্রথম বেঙ্গল ৩১ জুলাই শেষ রাতে কামালপুরের শক্তিশালী পাকিস্তানি অবস্থানটি আক্রমণ করে দখলে নিয়ে নেবে। তৃতীয় বেঙ্গলের সিও হিসেবে আমাকে ব্যাটালিয়ন নিয়ে ১ আগস্ট বাহাদুরাবাদ ঘাটে অবস্থিত পাকিস্তানিদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলো ধ্বংস এবং ঘাটটি অচল করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। অষ্টম বেঙ্গলকে নকশী-গজনী এলাকার পাক অবস্থান আক্রমণ করে দখল করার নির্দেশ দেয়া হলো।

কামালপুরে প্রথম বেঙ্গল পাক অবস্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েও অবস্থানটি দখল করতে পারে নি। পাকবাহিনীর প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণ এবং তীব্র প্রতিরোধের পর প্রথম বেঙ্গল ফিরে আসে। এই যুদ্ধে প্রথম বেঙ্গলের ৬৭ জন সৈন্য শহীদ এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়। একটি কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ যুদ্ধে শহীদ হন। অন্য কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন হাফিজ আহত অবস্থায় সেনাদলের সঙ্গে ফিরে আসে। পাকিস্তানিদের তরফেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। তাদের পক্ষে হতাহতের সঠিক সংখ্যা আমরা জানতে পারি নি, তবে যুদ্ধের তিনদিন পরও পাকবাহিনীকে হেলিকপ্টারে করে হতাহতদের সরিয়ে নিতে দেখা গেছে। এদিকে অষ্টম বেঙ্গল নকশী-গজনী এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানিদের অনেক

ক্ষয়ক্ষতি করলেও জায়গাটা দখলে আনতে পারে নি। এ যুদ্ধে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। আক্রমণে নেতৃত্বদানকারী অফিসার ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল) গুলিবিদ্ধ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় পড়ে থাকলে এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষের হাতে তার বন্দি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন ব্যাটালিয়ন কমান্ডার ক্যাপ্টেন আমিনুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দু'জন জেসিও এবং এনসিও'র সহায়তায় ক্যাপ্টেন আমিনকে উদ্ধার করে। এ অভিযানেও ব্যর্থতার মূল কারণ পাকবাহিনীর প্রচণ্ড মর্টার আক্রমণ। তাছাড়া এ ধরনের যুদ্ধে জয়ী হতে হলে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, কিন্তু আমাদের সেটা ছিল না। সর্বোপরি, কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন আমিন আহত হওয়ায় সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল।

এবার আমার অর্থাৎ তৃতীয় বেঙ্গলের অভিযানের কথায় আসা যাক। ৩১ জুলাই দুপুরে কামালপুর বিওপি'র কাছে হযরত শাহ কামালের (রা.) মাজার হয়ে আমরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করি। সেখান থেকে তিনটি ছোট-বড়ো নদী পেরোলে তবে আমাদের গন্তব্যস্থল বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাট। প্রায় পঁচিশ মাইলের পাড়ি। আমার সঙ্গে আলফা ও ডেলটা কোম্পানি, মর্টার প্লাটুন এবং ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার। আলফা কোম্পানির কমান্ডার ক্যাপ্টেন আনোয়ার, ডেলটার কমান্ডার লে. নূরন্নবী। কাদা-পানি ভেঙে হাঁটাপথে আমরা সবুজপুর ঘাটে পৌঁছলাম। স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ডজনখানেক নৌকা যোগাড় হয়ে গেলো। কিছুটা হেঁটে ও পরে নৌকায় অগ্রসর হয়ে রাত তিনটার দিকে খুব সাবধানতার সঙ্গে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদী পার হলাম। ঐ সময়টায় কয়েক মিনিট পরপরই পাকিস্তানিরা ঘাটের বার্জের ওপর থেকে বিভিন্ন দিকে সার্চলাইটের আলো ফেলে মেশিনগানের গুলি ছুঁড়তো। আমাদের প্ল্যান ছিল লে. নবীর ডেলটা কোম্পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট সংলগ্ন বার্জ ও রেলের খোলা বগিতে পাক মেশিনগান ও মর্টার অবস্থানগুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করবে এবং ঘাটে অবস্থানরত বার্জগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। আনোয়ার তার আলফা কোম্পানি নিয়ে নবীর রিয়ারের প্রোটেকশনের দায়িত্বে থাকবে। আনোয়ারের সঙ্গে আমিও থাকবো। নদীর পাড়ে রাখা নৌকাগুলো এবং পশ্চাদপসরণের রাস্তা নিরাপদ রাখা আনোয়ারের অন্যতম দায়িত্ব। ভোর পাঁচটার দিকে নবীর কোম্পানি পাকসেনাদের অবস্থানে আক্রমণ চালালো। আচমকা আক্রমণে প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গেলেও মিনিট দশেকের মধ্যে পাকবাহিনী নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে আমাদের অবস্থানে মেশিনগান ও মর্টার চালানো শুরু করে। পাকিস্তানিদের তিনটি বার্জ অকেজো করে দেয়া হলো। দুটো যাত্রীবাহী বগিতে বিশ্রামরত অজ্ঞাতসংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য গোলাগুলির মধ্যে পড়ে

নিশ্চিতভাবেই হতাহত হয়। কারণ বগি দুটোর ওপর কয়েকবার মেশিনগানের বার্স্ট ফায়ার করা হয়েছিলো। শান্টিংয়ের জন্য ব্যবহৃত দুটো ইঞ্জিনও ক্ষতিগ্রস্ত করা হলো। আধঘন্টার এই অপারেশনে পাকবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নি। আমাদের পক্ষে কয়েকজন বুলেটবিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বর্ষীয়ান নায়েব সুবেদার ভুলু মিয়া। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে স্ট্রেচারে করে ভারতীয় সীমান্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ভুলু মিয়া ইপিআর-এর একজন জেসিও ছিলেন। তার পোস্টিং ছিল দিনাজপুরের একটি বিওপিতে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে ২৫ মার্চ রাতে তিনি তাঁর বিওপির বাঙালি ইপিআরদের সহায়তায় অবাঙালি ইপিআর সদস্যদের নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেন। পরবর্তীকালে বাঙালপাড়ায় আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন তিনি।

অপারেশন শেষে নদী পার হয়ে আমরা একটি নিরাপদ জায়গায় একত্র হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এখনই তেলঢালায় ফিরে না গিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে আরো কিছুদিন থাকবো। আরো কয়েকটি অভিযান চালিয়ে পাকবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের মনোবলে চিড় ধরানোর চেষ্টা করবো। বাংলাদেশে যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে, সেটাও সবাইকে জানান দেয়া দরকার। আমরা দেওয়ানগঞ্জ চিনিকল ও রেলস্টেশন সংলগ্ন পাকবাহিনীর ঘাঁটিগুলো আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিনই ১২টা নৌকায় করে পুরনো ব্রহ্মপুত্র ধরে রওনা হলাম। পাঁচশো থেকে হাজার মণী বিশাল একেকটা নৌকা। এসময় দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ ঘাটের মাঝামাঝি জায়গায় রেলওয়ে ব্রিজটি ধ্বংস করার জন্য নায়েব সুবেদার করম আলীর নেতৃত্বে একটা প্লাটুন পাঠানো হলো। তারা সাফল্যের সঙ্গেই ঐ দায়িত্ব পালন করে। এদিকে পথে একটি গ্রামের বাসিন্দারা বেশ সমাদর করে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলো। প্রায় সাড়ে চারশো সৈন্যকে খাওয়ানোর জন্য গরু জবাই করলো তারা। দুপুরের খাওয়া তো হলোই, সঙ্গে তারা রাতের খাবারও দিয়ে দিল। গরিব গ্রামবাসীরা গরু জবাই করায় তাদেরকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম। তারা টাকা তো নেবেই না, উল্টো খানিকটা রেগেও গেলো। গ্রামবাসীরা বললো, 'আমরা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে পারছি না, আপনাদেরকে যে সাহায্য করছি, সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের এই শান্তিটা থেকে বঞ্চিত করবেন না।' সন্ধ্যায় সেই গ্রাম থেকে আবার রওনা হলাম। দেওয়ানগঞ্জের মাইল দেড়েক সামনে এগিয়ে গিয়ে থামলাম আমরা। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল নবী তার কোম্পানি নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ স্টেশন সংলগ্ন পাকসেনাদের অবস্থানে হামলা করবে। চিনিকলের রেস্ট হাউসে অবস্থানরত পাকসেনাদের ওপর আক্রমণ করবে আনোয়ার। আর হেড কোয়ার্টার কোম্পানি নিয়ে আমি ঘাটের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবো। কথা ছিল নবীর কোম্পানির হামলার গুলির শব্দ

শুনলেই আনোয়ার সুগার মিলের রেস্ট হাউস এলাকা আক্রমণ করবে। নবীর কোম্পানি স্টেশনে পাকসেনাদের অবস্থানে সফল অপারেশন করার পর সকাল ন'টার দিকে ঘাটে ফিরে আসে। ওদিকে সুগার মিলে হামলা চালিয়ে আনোয়ার তার কোম্পানি নিয়ে আগেই এসে গিয়েছিল। আনোয়ারের আলফা কোম্পানির বেশির ভাগ সৈন্যই নদী পার হয়ে কাছের একটি গ্রামে অবস্থান নিয়েছিল। এসময় মাথার ওপর পাকিস্তানি বিমান ও হেলিকপ্টার চক্কর দিতে শুরু করায় নবীর কোম্পানিও নদী পার হয়ে কাছাকাছি আরেকটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। এখানেও গ্রামবাসীদের পিড়াপিড়িতে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হলো। তারা আমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। রাতে সবুজপুর ঘাট এলাকার গ্রামটিতে ফিরে এলাম আমরা। পরের দিন বাহাদুরাবাদ ঘাটে বহু গানবোট ও লঞ্চ আসা-যাওয়া করলেও তাদের একটাকেও মেশিনগান বা রকেট লাঞ্চারের পাল্লার মধ্যে পাওয়া গেলো না। পাকিস্তানিরা প্রচুর সৈন্য এনে বাহাদুরাবাদে তাদের অবস্থান আবার সুরক্ষিত করেছিল।

দেওয়ানগঞ্জ অভিযানে এক মজার ঘটনা ঘটে। রেল স্টেশন অপারেশন শেষে ফেরার সময় নবী মাদ্রাসা থেকে ছ'জন সশস্ত্র রাজাকারকে বন্দি করে নিয়ে আসে। হত্যা বা কোনোরকম শাস্তি না দিয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই এবং তারা আমাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। দেওয়ানগঞ্জের এই রাজাকাররা বলেছিল, তারা পাকিস্তানিদের ভয়ে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ রাজাকারই পারিপার্শ্বিকতার চাপে ও কিছুটা আর্থিক অনটনের কারণেও রাজাকারদের দলে নাম লিখিয়েছিল। বলা বাহুল্য, মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর ক্যাডার এবং বিহারি এবং শহুরে রাজাকাররা এই দলভুক্ত নয়। তারা স্বাধীনতাকামী বাঙালি নিধনে মেতে উঠেছিল পাকিস্তানিদের মনে-প্রাণে সমর্থন করেই। গ্রামের রাজাকারদের অনেকে বাইরে রাজাকার হিসেবে পরিচিত ছিল কিন্তু তারা অনেক সময়ই বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। সবুজপুরে আমরা পাকিস্তানিদের পাল্টা হামলা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকলেও তারা হামলা করে নি। তেলঢালায় ফিরে চললাম আমরা।

কিছুদিন পর খবর পাই, পাকিস্তানি সৈন্যরা সবুজপুর এলাকায় গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। ফিরতি পথে দেখি শাহ কামালের মাজারের কাছে একটা জিপের পাশে মেজর জিয়া স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। তিনি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন আমাদের কাছে। মেজর জিয়াসহ সবার ধারণা হয়েছিল, পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আমাদের। আমরা মেজর জিয়াকে অন্য অভিযানগুলোর কথা জানালাম। জিয়া তখন প্রশ্ন

করলেন, কেন আমরা অপরিকল্পিত অভিযান করতে গেলাম। আমি উত্তর দিলাম, বাহাদুরাবাদ অভিযানের সাফল্যে সবাই খুব উৎসাহিত হওয়ায় আমরা পরবর্তী অভিযানের সিদ্ধান্ত নিই। স্বদেশের মাটিতে পা রেখে যুদ্ধ করতে সবাই উদ্গ্রীব। কেউ তো ফিরতেই চায় না। আর এ ক'দিন ভেতরে থেকে বুঝলাম, বাংলাদেশে অবস্থান করে যুদ্ধ চালানো কোনো ব্যাপারই না। আমাদের পক্ষে এখন বাংলাদেশের যে-কোনো জায়গায় যাওয়া এবং সেখানে থাকা সম্ভব। আমার কথায় জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া বেশ উৎসাহ বোধ করলেন। হেসে বললেন, তাহলে তো সবাইকে নিয়ে একবার ভেতরে ঢুকতে হয়!

রৌমারীর প্রতিরক্ষায়

সৌভাগ্যক্রমে তেলঢালায় ফেরার পর দিনই আবার বাংলাদেশে ঢোকার সুযোগ পেলাম। জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া রৌমারী থানার প্রতিরক্ষা জোরদার করার দায়িত্ব দিলেন আমাকে। রৌমারী থানা তখন মুক্ত এলাকা। জুলাইয়ের শেষের দিকে পাকবাহিনী চিলমারী এবং বাহাদুরাবাদ থেকে অগ্রাভিযান শুরু করলে রৌমারীর প্রতিরক্ষা হুমকির মুখে পড়ে। উল্লেখ্য, ৩১ মার্চ সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যদের হামলার পর পালিয়ে আসা ৩০/৩২ জন সৈন্যের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ নায়েব সুবেদার আলতাফ আর হাবিলদার মনসুরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। আলতাফ ঐ ক'জন সেনাসদস্য এবং ছাত্র-যুবক-কৃষকদের নিয়ে দু' থেকে আড়াইশো লোকের একটা বাহিনী গড়ে তুলে রৌমারী-চর রাজীবপুরে প্রতিরক্ষা অবস্থান নেয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমি লে. নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারকে রৌমারীর প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করি। এসময় আমাকে ইপিআর-এর দুটো লঞ্চ দেয়া হয়। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরই ইপিআর-এর চালকরা লঞ্চ দুটো নিয়ে মানকার চরে অবস্থান নেয়। মোগল সেনাপতি মীর জুমলার মাজার সংলগ্ন নদীর ঘাটে লঞ্চ দুটো ভেড়ানো থাকতো। লঞ্চে করে প্রায় প্রতিদিনই রৌমারী এলাকা পরিদর্শনে যেতাম আমি। মাতৃভূমিতে অবস্থান করার উদগ্র বাসনায় মেজর জিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গী হতেন। এ সময়কার কয়েকটি ঘটনা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে দেশের মানুষের সংগ্রামী চেতনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই।

একদিন লঞ্চে করে মেজর জিয়াকে নিয়ে রৌমারীর মুক্তাঞ্চল পরিদর্শনে যাচ্ছি। হঠাৎ নদীর তীরের একটি অদ্ভুত দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো আমাদের। নদীর পাড়ে একটি খোলা মাঠের মধ্যে বেশ কিছু কিশোর-তরুণ পিটি করছে। তাদের সংখ্যা অন্তত পাঁচ ছয়শো হবে। এরকম কোনো ক্যাম্পের খবর আমাদের জানা ছিল না। মেজর জিয়া বললেন, লঞ্চ থামাতে

বলো। এরা কে, উদ্দেশ্যই-বা কি একটু খোঁজখবর নেয়া দরকার।

লঞ্চ থামিয়ে আমরা তীরে নামলাম। একজন মাঝবয়সী লোক পিটি পরিচালনা করছিলেন। জিগ্যেস করে জানা গেলো তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। এই তরুণদের শরীর চর্চা করাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলার লক্ষ্যে। ছেলেগুলোর চেহারা মলিন। শিক্ষকটির কাছে শুনলাম ক'দিন ধরে একপেট-আধপেট খেয়ে পিটি করছে এরা। তবু কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই। এদের অদম্য মনোবল আর দেশাত্মবোধের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হলাম।

জিয়া আমাকে বললেন, 'শাফায়াত, তোমাদের তো অনেক সময় বাড়তি রেশনটেশন থাকে। মাঝে-মধ্যে এদের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিও।'

আর একদিনের কথা। মেজর জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে জিপ চালিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে ঢালুতে যাচ্ছি। দুটো এলাকাই ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে। উদ্দেশ্য সীমান্ত এলাকার মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প পরিদর্শন। পথে এক জায়গায় দেখলাম, কয়েকশো তরুণ-যুবকের একটি দল পায়ে হেঁটে ঢালুর দিকে চলেছে। কৌতূহলী হয়ে আমরা গাড়ি থামালাম। একজনকে ডেকে জিগ্যেস করে জানা গেলো, তারা ঢালুর ইয়ুথ ক্যাম্পে যোগ দেয়ার জন্য যাচ্ছে। মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগ দেয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রথমে ইয়ুথ ক্যাম্পে যেতে হতো। সেখানে বাছাই পর্বের পর কেবল নির্বাচিতদেরকে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্তি করা হতো। এই ছেলেগুলো এসেছে সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও গাইবান্ধা থেকে। তারা প্রথমে মানকার চরে গিয়ে সেখানকার ইয়ুথ ক্যাম্পে জায়গা পায় নি। মহেন্দ্রগঞ্জে গিয়েও দেখে একই অবস্থা। তাই ঢালুতে যাচ্ছে সেখানে জায়গা পাওয়া যায় কি না, সেটা দেখতে। দেখলাম, এদের অনেকেই অসুস্থ, কারো গায়ে ১০২ থেকে ১০৩ ডিগ্রি জ্বর। ওরা জানালো, গত ২/৩ দিন তাদের খাওয়া-দাওয়া একরকম হয় নি বললেই চলে। এদের অদম্য মনোবল দেখে অভিভূত হলাম। সবাইকে উৎসাহ দিয়ে আমরা অসুস্থদের মধ্যে যে ক'জনকে পারলাম গাড়িতে তুলে নিলাম। পরে তাদের ঢালুতে নামিয়ে দিই।

এসময় রৌমারীর ছালিয়াপাড়া, কোদালকাটি অঞ্চলে লে. নবী ও ক্যাপ্টেন আনোয়ারের সৈন্যদের সঙ্গে পাকবাহিনীর বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। এসব সংঘর্ষের পরিণতিতে পাকবাহিনীকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পিছিয়ে যেতে হয়। রৌমারীর সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। মুক্তাঞ্চলটি গোটা রৌমারী থানা এবং দেওয়ানগঞ্জ থানার বৃহদংশ জুড়ে, যার আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে চারশো বর্গমাইল। এই বিশাল মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষায় তৃতীয় বেঙ্গলের দুটো কোম্পানি ছাড়াও তিনটি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে প্রতিরক্ষা

কার্যক্রমে আমাদের সাহায্য করার জন্য প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গলের একটি করে কোম্পানি পাঠানো হয়। আমার বাহিনী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় পাকবাহিনীর আক্রমণের মোকাবেলা করে। কিন্তু তিল পরিমাণ ভূমিও তারা পাকিস্তানিদের কাছে ছেড়ে দেয় নি।

বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসন গঠন

রৌমারীতে বাংলাদেশের প্রথম প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মেজর জিয়ার নির্দেশে লে. নবী এই বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলে। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে নবী একটি নগর কমিটি গঠন করে, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিটি সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। নবী রৌমারীতে কাস্টমস্ অফিস, থানা, স্কুল এবং পোস্ট অফিসের কাজ শুরু করেছিল। ১০-শয্যার একটি হাসপাতালও চালু করে সে। মেজর জিয়া ২৭ আগস্ট সকাল আটটায় রৌমারীতে মুক্ত বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট অফিস উদ্বোধন করেন। এরপর আরো কয়েকটি অফিস উদ্বোধন করেন তিনি। বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি লে. নবী রৌমারী সদরে একটি বড়ো আকারের ট্রেনিং ক্যাম্পও স্থাপন করে। সেখানে কয়েক হাজার তরুণ-যুবকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

রৌমারীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া আমাকে বকশীগঞ্জে পাকবাহিনীর অবস্থানে হামলা করার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ক্যাপ্টেন আকবর এবং ক্যাপ্টেন মোহসীন আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেন। ক্যাপ্টেন আকবর পরে লে. কর্নেল এবং মন্ত্রী। ক্যাপ্টেন মোহসীন পরে ব্রিগেডিয়ার এবং সাজানো মামলায় ফাঁসিতে নিহত। তাদের দু'জনকে ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত করি আমি। এর আগে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফ আমার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। তাকে অ্যাডজুটেন্টের দায়িত্ব দিলাম। মেডিকেল অফিসার করলাম ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র ওয়াহিদকে। ব্রাভো ও চার্লি কোম্পানি বকশীগঞ্জ অভিযানে অংশ নেয়। সেখানকার পাক অবস্থানে হামলাকালে আমাদের পক্ষে কয়েকজন হতাহত হয়। এ অপারেশনে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নি। তেলঢালায় থাকতেই আমি রৌমারী থেকে প্রায় দেড়শো ছাত্রকে রিক্রুট করে ট্রেনিং দিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের জন্য একটি আলাদা কোম্পানি গঠন করি। ওই ছাত্রদের বেশির ভাগই এসেছিল পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর ও জামালপুর থেকে। ইকো নামের এই কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত করি আখতার নামের একজন ছাত্রকে। বর্তমানে আখতার সামরিক বাহিনীর একজন কর্মরত কর্নেল। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কোম্পানিটি গঠন করি। তেলঢালায় অবস্থানকালে এদেরকে অবশ্য কোনো অপারেশনে পাঠানো হয় নি। তবে পরবর্তীকালে ছাতকের যুদ্ধে তারা অসাধারণ সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকী

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ভারত থেকে অস্ত্র নিয়ে ফেরার পথে টাঙ্গাইলের গেরিলা কমান্ডার কাদের সিদ্দিকী রৌমারীতে নবীর কাছে এসেছিলেন পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে আলোচনার জন্য। আমি তখন নবীর ওখানে ছিলাম। কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি টাঙ্গাইলে তাঁর প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে জানালেন।

এনবিসি টিভির কর্মীরা

মধ্য সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের এনবিসি টিভি নেটওয়ার্কের চার সদস্যের একটি দল মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্যচিত্র তোলার উদ্দেশ্যে রৌমারীতে আসে। দলটির নেতা ছিলেন রবার্ট রজার্স। এই দলটি দিন তিনেক রৌমারীতে ছিল। তাঁরা সম্মুখযুদ্ধ, গেরিলা ট্রেনিং এবং মুক্তাঞ্চলের স্বাভাবিক প্রশাসনিক তৎপরতা ক্যামেরাবন্দি করেন। এনবিসির কর্মীরা সম্মুখযুদ্ধের ছবি তুলতে চাইলে তাঁদেরকে রৌমারী থেকে নৌকায় করে আরো ভেতরে চিলমারীর কাছে এক চরে নিয়ে গেলাম আমরা। তারপর সেখান থেকে পাকিস্তানি অবস্থানে মর্টারের গোলা ছোঁড়া হলো। আর যায় কোথা! পাকসেনারা আমাদের ঐ মর্টারের গোলার প্রত্যুত্তরে বৃষ্টির মতো গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। মিছেমিছি যুদ্ধের ছবি তুলতে গিয়ে সত্যিকারের যুদ্ধ বেধে যায় আর কি! মার্কিন সাংবাদিকরা তো রীতিমতো ভড়কে গেলেন। তাড়াতাড়ি তাঁদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে এলাম আমরা। পরে ওই প্রামাণ্য চিত্রটি বিশ্বব্যাপী প্রদর্শিত হয়। ফলে স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে দৃঢ় হয় বিশ্বজনমত। "A country made for disaster" নামে প্রামাণ্যচিত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

এবার সিলেট রণাঙ্গনে

৮ অক্টোবর তৃতীয় বেঙ্গলকে সিলেটে মুভ করার নির্দেশ দেয়া হলো। রৌমারীর মুক্তাঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ১১ নম্বর সেক্টরের অন্যতম সাব-সেক্টর কমান্ডার ফ্লা. লে. হামিদউল্লাহর হাতে অর্পণ করা হয়। ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্বভার দেয়া হলো মেজর তাহেরকে (পরে কর্নেল অব. ১৯৭৬-এ রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ফাঁসিতে নিহত)। তৃতীয় বেঙ্গল অর্থাৎ আমাদেরকে এখন যেতে হবে সিলেট অঞ্চলে পাঁচ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলীকে সহায়তা করার জন্য। ১০ অক্টোবর ব্যাটালিয়নকে তেলঢালায় একত্র করে সেদিনই ৫৯টি বড়ো ট্রাকে করে গন্তব্যস্থল শিলংয়ের উদ্দেশে রওনা হলাম।

সিলেট অঞ্চলে অভিযান এবং চূড়ান্ত বিজয়

বাঁশতলার পথে

তুরা পাহাড়ের ডেলঢালা ক্যাম্প থেকে ১০ অক্টোবর আমরা রওনা হলাম। আমাদের বহরে প্রায় একশো গাড়ি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ৫৯টা সিভিল ট্রাক দিয়েছিল, বাকিগুলো আমার ব্যাটালিয়নের জিপ, ডজ, থ্রি টন এই সব। টানা দু'দিন দু'রাত চলার পর গৌহাটিতে পৌঁছুলাম। গৌহাটি থেকে শিলং। শিলং থেকে দীর্ঘ পাহাড়ি ও বিপদসঙ্কুল রাস্তা পাড়ি দিয়ে বৃষ্টিবহুল চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলাম আমরা। মেঘের দেশ চেরাপুঞ্জি। চারদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে নানা আকারের পাথর। চোখে পড়লো অনেক পাহাড়ি ঝরনা। আর বহু উঁচুতে বলে হাত বাড়ালেই যেন মেঘের নাগাল! আকাশের গা-ছোঁয়া পাহাড়ি রাস্তা ধরে চলেছি, হঠাৎ করেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। গাড়ির সামনে পথের ওপর ভেসে এসেছে এক টুকরো মেঘ! তাই এ বিপত্তি। ভাসমান মেঘটা সরে যেতেই আবার যাত্রা। ৫ হাজার ফুট নিচে দিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ। অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল।

চেরাপুঞ্জির বৃষ্টির কথা এতোদিন কানে শুনেছি, এবার চোখে দেখা হলো। এই অক্টোবর মাসেও ক'দিনের যাত্রায় চেরাপুঞ্জির বৃষ্টিতে ভেজার অভিজ্ঞতা হলো। চেরাপুঞ্জি হয়ে আমরা এলাম শেলা বিওপিতে। শেলা বিওপির অবস্থান সিলেটের ছাতক শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে, ভারতে। শেলা বিওপির পাশেই বাঁশতলা নামে একটা জায়গা। গোটা জায়গা জুড়ে শুধু ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। আপাতত জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেকগুলো তাঁবু পেতে বাঁশতলায় ক্যাম্প করলাম আমরা। এই ক্যাম্পেই ক্যাপ্টেন আকবর, আশরাফ আর আমার পরিবারের থাকার ব্যবস্থা হলো। আমাদের পরিবার এর আগে ছিল তুরার উপকণ্ঠে একটা ভাড়া বাড়িতে। বাঁশতলা আসার সময় আকবর গিয়ে ওদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। এজন্য সে আমাদের একদিন পর রওনা হয়। বাঁশতলায় আমাদের গুছিয়ে উঠতে উঠতে বেলা গড়িয়ে গেলো।

সেক্টর কমান্ডার মীর শওকত ও ভারতীয় জেনারেল গিল

সন্ধ্যায় ভারতীয় ১০১ কম্যুনিকেশন জোনের জিওসি মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিল এবং ৫ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলী (পরে লে. জেনারেল অব.) আমাদেরকে স্বাগত জানাতে এলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে জে. গিল এবং মেজর শওকত জানালেন, সেদিন ভোর রাতেই আমাদেরকে অপারেশনে যেতে হবে। তারা বললেন, পুরো ব্যাটালিয়ন এই অপারেশনে যাবে, সঙ্গে দেয়া হবে আরো তিনটি এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) কোম্পানি। এফএফ কোম্পানিগুলো ছিল সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আলীর অধীনে। ৫ নম্বর সেক্টরে এসময় কোনো নিয়মিত সেনাদল ছিল না। এই সেক্টরে অপারেশন চালাতে মেজর শওকতকে সাহায্য করার জন্য জেড ফোর্স থেকে সাময়িকভাবে আমাদেরকে পাঠানো হয়। এদিকে জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া তুরা থেকে সিলেটের পূবদিকে মুভ করলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গল। তৃতীয় বেঙ্গলকে নিয়ে আমি এলাম সিলেটের উত্তরাঞ্চলে। যাই হোক, সেক্টর কমান্ডার মেজর শওকত এবং ভারতীয় জেনারেল গিল বললেন, আমাদেরকে (তৃতীয় বেঙ্গলকে) প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে অবস্থিত পাকসেনাদের অবস্থান দখল করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে দখল করতে হবে ছাতক শহর।

পৌঁছানো মাত্রই অপারেশনের অর্ডার শুনে আমরা কিছুটা অবাক হলাম। এই অঞ্চলে আমরা কেউ আগে আসি নি। এলাকাটা সম্পর্কে আমাদের কারোরই কোনো ধারণা নেই। যে অবস্থানটা দখল করতে বলা হলো, সেটা বাঁশতলা থেকে দশ-বারো মাইল দূরে। চারদিকে শুধু বিল আর হাওর। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আর শহরের মাঝখানেও বিরাট সুরমা নদী। এক কথায় খুবই দুর্গম এলাকা। তার ওপর আমাদের কাছে ম্যাপ, কম্পাস বা যোগাযোগের সরঞ্জাম (Signal sets) বলতে কিছুই দেয়া হয় নি।

অবাস্তব এক অভিযানের পরিকল্পনা

প্রায় ৪শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সবাই খুব ক্লান্ত। আর এ অবস্থাতে সেদিন ভোর রাতেই অভিযানে যেতে হবে। একেবারে অবাস্তব পরিকল্পনা। সাধারণ বাস্তববুদ্ধি-বিবর্জিত উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। যাই হোক, অপারেশনের নির্দেশনা দেয়া হলো এরকমের— ক্যাপ্টেন মোহসীন তার চার্লি কোম্পানি নিয়ে ছাতকের উত্তর-পশ্চিমে দোয়ারাবাজারের নিকটবর্তী টেংরাটিলা দখল করবে, যাতে করে পাকসেনারা তাদের অবস্থানের সাহায্যার্থ ছাতকের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। দোয়ারাবাজারে পাকিস্তানিদের ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারির একটি দল প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। ছাতক ও ভোলাগঞ্জের মধ্যে ছিল একটা রোপওয়ে। সেই রোপওয়ে দিয়ে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির

জন্য ভোলাগঞ্জ থেকে চুনাপাথর আনা হতো। রোপওয়েটির প্রায় নিচ দিয়েই ভোলাগঞ্জ থেকে ছাতক পর্যন্ত একটা হাঁটাপথও আছে। পথটা গিয়ে পৌঁছেছে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি পর্যন্ত। সিমেন্ট ফ্যাক্টরির মাইল দেড়েক উত্তরে আরেকটি পায়ে-চলা-পথ দোয়ারাবাজারের দিক থেকে এসে এই রোপওয়ের নিচের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। ঐ রাস্তা ধরে পাকিস্তানি সৈন্যরা যাতে আমাদের মূল বাহিনীর পেছনে এসে আক্রমণ করতে না পারে, সে জন্যই দোয়ারাবাজার দখল করতে হবে। ইকো কোম্পানি থাকবে এই হাঁটাপথ দুটোর সংযোগস্থলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে, যাতে শত্রুপক্ষ দোয়ারাবাজার থেকে আমাদের পেছনে কোনো সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে।

ছাতক শহর ও সিলেটের মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ বলে একটা জায়গা আছে। গোবিন্দগঞ্জে সিলেট-ছাতক এবং সিলেট-সুনামগঞ্জ রাস্তা এসে মিলেছে। সীমান্ত থেকে বাংলাদেশের দিকে মাইল বিশেক ভেতরে এর অবস্থান। ছাতক শহর থেকে দূরত্ব ১০ মাইল। লে. নূরন্নবীকে তার ডেলটা কোম্পানি নিয়ে এই গোবিন্দগঞ্জের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হলো। সিলেট থেকে ছাতকে পাকিস্তানি রিইনফোর্সমেন্ট আসা ঠেকাতে হবে তাকে। সেই সঙ্গে ছাতক থেকে যেন পাকসেনারা সিলেটে পশ্চাদপসরণ করতে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। ছাতক অবরোধ এবং দখলের জন্য মূল ফোর্স হিসেবে রইলো আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি, ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইকো কোম্পানি এবং সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকতের দেয়া তিনটি এফএফ কোম্পানি। এ ছয়টি কোম্পানি প্রথমে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে দখল করবে। এরপর নদী পার হয়ে ছাতক শহরে অভিযান চালাবে। ভারতীয়রা জানালো, তারা এসময় আর্টিলারি সাপোর্ট দেবে।

শুরু হলো অপারেশন

অপারেশন শুরু হওয়ার কথা পরদিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবর ভোর পাঁচটায়। রাতে রওনা হলাম আমরা। মেজর শওকত এ সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। পরিকল্পনা মতো আলফা ও ব্রাভো কোম্পানি বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও আকবরের নেতৃত্বে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। তাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় টিকতে না পেরে সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সৈন্যরা এক পর্যায়ে ফ্যাক্টরির অবস্থান ছেড়ে দিয়ে সুরমা নদীর ওপারে ছাতক শহরে পিছিয়ে গেলো। ৩০ এফএফ এবং টোচি স্কাউটস-এর সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করছিল। আনোয়ার সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে সেখানে অবস্থান নেয়। আকবর ঠিক তার পেছনেই, মাঝখানে একটা বিল।

এদিকে দোয়ারাবাজারে একটা বিপর্যয় ঘটে গেলো। দোয়ারাবাজার ঘাটে আগে থেকেই পাকিস্তানিরা তৈরি হয়ে ছিল। পাকসেনা, রাজাকার বাহিনী এবং

পাকিস্তান থেকে আসা ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি তখন ঘাট এলাকায় প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। হাওর-বিল পার হয়ে মোহসীন ও তার চার্লি কোম্পানি দোয়ারাবাজার ঘাটে নামার আগেই তারা গুলি চালাতে শুরু করে। খুব সম্ভবত রাজাকারদের কাছ থেকে তারা আমাদের আগমনের খবর পেয়ে যায়। খবর পাওয়ার কথাই। প্রায় শ' খানেক গাড়ির বহর আমাদের। হেড লাইট জ্বালিয়ে এতোগুলো গাড়ি আসছে, সেটা চোখে পড়া খুবই স্বাভাবিক। আর উঁচু পাহাড়ি রাস্তা বলে অনেক দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। পাকসেনারা বুঝে গিয়েছিল, এ এলাকায় আমাদের সৈন্য সমাবেশ হচ্ছে। সে জন্য তারা পুরোপুরি সতর্ক ছিল। মোহসীনের কোম্পানিটা নৌকায় থাকা অবস্থাতেই পাকিস্তানিরা গুলি চালাতে শুরু করলে বেশ কয়েকটি নৌকা পানিতে ডুবে যায় এবং অতর্কিত আক্রমণে পুরো কোম্পানিই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই যুদ্ধের দিন তিনেক পরও আমি মোহসীনের কোম্পানির জন্য ত্রিশেক সহযোদ্ধার কোনো খবর পাই নি। এরা শহীদ, আহত, না বন্দি— কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। দেড়শো যোদ্ধার প্রায় ষাট শতাংশ অস্ত্রই পানিতে পড়ে যায়। প্রাণ রক্ষার্থ আমাদের সৈন্যরা হাওরের গভীর পানিতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিতে বাধ্য হয়। কাজেই কোম্পানি তাদের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ দোয়ারাবাজার দখল এবং প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে ব্যর্থ হলো। ওদিকে নৌকা যোগাড় করতে দেরি হওয়ায় গোবিন্দগঞ্জে পৌছুতে নবীর কিছুটা বিলম্বই হয়ে যায়। সেই সুযোগে পাকিস্তানিরা ছাতকে তাদের ট্রুপস্ রিইনফোর্সমেন্ট পাঠিয়ে দেয়। তারা ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির আশপাশে আমাদের অবস্থানে প্রচণ্ড শেলিং শুরু করলো। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করার জন্য আমরা সেখানে কিছু শেলিং করেছিলাম। ফ্যাক্টরি দখল হয়ে গেলে ছাতক শহরের ওপর কিছু গোলাবর্ষণ করা হয়। কিন্তু বেসামরিক লোকদের হতাহত হওয়ার আশঙ্কায় কিছুক্ষণ পরই শহরে গোলাবর্ষণ বন্ধ করা হলো। এদিকে নবীর গোবিন্দগঞ্জে পৌছুতে দেরি হওয়ার সুযোগে সিলেট থেকে পাকবাহিনীর নতুন সৈন্য এসে যায়। ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের দু'কোম্পানি এবং ৩১ পাঞ্জাবের এক কোম্পানি সৈন্য ছাতক শহরে পৌঁছে যায়। নবী গোবিন্দগঞ্জে পৌঁছানোর পরদিন পাকসেনাদের ঐ কোম্পানিগুলোর একটি অংশ তার ওপর আক্রমণ চালায়। নবী সেখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। পাকসেনাদের কিছু ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে এক পর্যায়ে সে পিছিয়ে আসে।

লে. নবীর গোবিন্দগঞ্জ পৌছুতে দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ, আমাদের কাছে ওখানকার কোনো ম্যাপ ছিল না। প্রায় ৪শ' মাইল রাস্তা গাড়ি দিয়ে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে আমরা ঐ এলাকায় পৌছুই। আমাদের কাছে এলাকাটি ছিল এক বিশাল প্রশ্নবোধকের মতো। আমাদের অনেকেই এর আগে কখনো হাওর দেখে নি। তার ওপর আমাদের কোনো Signal Sets দেয়া হয় নি।

পুরো যুদ্ধের সময়টাই আমাদের (ব্যাটালিয়ন থেকে কোম্পানি এবং কোম্পানি থেকে প্লাটুন) যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল রানার এবং তার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা চিঠিপত্র। এরকম বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদেরকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।

প্রথাগত (Conventional) যুদ্ধ, যেমন Attack এবং Defence—দুটোতেই বহুবার অংশ নিয়েছি আমরা কোনো Signal communication ছাড়াই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করেছি। যেমন বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ, রৌমারীর প্রতিরক্ষা এবং ছোটখেল আক্রমণ ও দখল। আবার ছাতক ও গোয়াইনঘাট অভিযানের মতো ব্যর্থতাও ছিল।

নবীর সঙ্গে যাওয়া স্থানীয় গাইডরা অন্ধকার রাতে হাওরে চলতে গিয়ে দিক হারিয়ে ফেলেছিল। অবশ্য এর চাইতেও বড়ো কারণ ছিল। তা হচ্ছে, নবীর অধীনস্থ দু'জন প্লাটুন কমান্ডারের সঙ্গে তার অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি। নবী EME Corps-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার অফিসার। পদাতিক ব্যাটালিয়নের বর্ষীয়ান এবং অনেকদিনের চাকরির অভিজ্ঞতালব্ধ দু'জন প্লাটুন কমান্ডার (জেসিও) এই বিপদসঙ্কুল অভিযানের যৌক্তিকতা নিয়ে যাত্রাপথে সন্দেহ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা একজন অ-পদাতিক (Non Infantry) বাহিনীর অফিসারের অধীনে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে পাকবাহিনীর মোকাবেলা করতে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিল না। এই অভিযানের আদেশ পেয়ে জেসিও দু'জন একরকম আতঙ্কিতই হয়ে পড়ে। যাত্রাপথেই এরকম অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য! কোনোমতে তাদেরকে মানিয়ে নিয়ে নবী কয়েক ঘন্টা পরে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছায়। এরি মধ্যে পাকিস্তানিদের ৩০ এফএফ রেজিমেন্টের রিইনফোর্সমেন্ট এবং কয়েকটা আর্টিলারি গান ছাতকে পৌঁছে যায়। এদেরই একটা অংশ পরদিন নবীর গোবিন্দগঞ্জ অবস্থানে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর নবী পশ্চাদপসরণ করে ভোলাগঞ্জে অবস্থান নেয়। সেখান থেকেই সে যাত্রা শুরু করেছিল। গোবিন্দগঞ্জের যুদ্ধে পাকবাহিনীর একজন অফিসারসহ অনেক সৈন্য হতাহত হয়।

আমরাও এ যুদ্ধে বেশ কয়েকজন যোদ্ধাকে হারাই। ছাতক যুদ্ধ শেষে পুরো ঘটনা জানতে পেরে আমি ঐ দু'জন জেসিও-কে Close করে বাঁশতলায় পাঠিয়ে দিই। বাঁশতলায় তখন আমার ব্যাটালিয়নের এলওবি। যুদ্ধ শেষে তাদেরকে অন্য একটি ব্যাটালিয়নে বদলি করা হয়।

আনোয়ার ও আকবরের পশ্চাদপসরণ

এদিকে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে আনোয়ার ও আকবর দু'দিন ধরে সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে। এই দু'দিনের মধ্যে পাকিস্তানিরা ছাতকে যে

রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে এলো, সেটা দোয়ারাবাজারে এসে আমাদের পেছনে সমবেত হতে লাগলো। আমাদের অগ্রবর্তী সৈন্যরা তখন সুরমা নদীর সামনে পৌঁছে গেছে। ক্যাপ্টেন আনোয়ার তাদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিরা দোয়ারাবাজার দিয়ে আমাদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে। আমাদের পেছনে আবার ছিল ইকো কোম্পানি অর্থাৎ ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারা। পাকসেনাদের সঙ্গে তাদেরও প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ইকো কোম্পানির ছেলেরা এ সময় দুর্দান্ত লড়াই করে। এ যুদ্ধে তাদের বেশ কয়েকজন যোদ্ধা নিজেদের অবস্থানে থেকে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে শহীদ হয়। ইকো কোম্পানির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে পাকিস্তানিদের অগ্রাভিযান কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। এক পর্যায়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পাকবাহিনীর হস্তগত হলে তারা আমাদের পেছনে এসে পড়ে। এ কারণে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।

ক্যাপ্টেন আনোয়ারের আলফা কোম্পানি তখন দখলিকৃত সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে অবস্থান করছে। তার পেছনেই একটি ছোট বিলের পাড়ে উঁচু টিলার মতো জায়গায় ক্যাপ্টেন আকবরের ব্রাভো কোম্পানি। এদিকে পাকবাহিনীর রিইনফোর্সমেন্ট (৩০ এফএফ ও ৩১ পাঞ্জাব) দোয়ারাবাজার হয়ে ইকো কোম্পানির অবস্থান পর্যুদস্ত করে আমাদের অবস্থানের প্রায় পেছন এসে পড়েছে। আনোয়ার এবং আকবরের অবস্থানের ওপর পেছনে দিক থেকে একটা আক্রমণ অত্যাসন্ন। আমি তখন ক্যাপ্টেন মোহসীনের চার্লি কোম্পানির উদ্ধারপ্রাপ্ত সেনাদের সঙ্গে ইকো কোম্পানির অবস্থান পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছি। যুদ্ধে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা। আমাদের কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। পাকিস্তানিরা অনবরত শেলিং করে যাচ্ছে। সবগুলোই Air burst অর্থাৎ আকাশেই ফেটে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে নিচে আঘাত হানছে। আনোয়ার ও আকবরের অবস্থানগুলোতে পেছন দিক থেকে রাইফেল আর এলএমজির গুলিও গিয়ে পড়ছিল। চারদিকে একটা সংশয় আর অনিশ্চয়তা। বিশেষ করে অবস্থানের পেছনদিককার গোলাগুলি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের বেসামাল অবস্থা। আক্রমণ করতে এসে এখন নিজেরাই আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এই পরিস্থিতিতে সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকত আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় স্থগিত রেখে আকবরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। আকবরের অবস্থানের ঠিক পেছনে অবস্থান করছিলেন তিনি। আনোয়ারকে ফিরে আসার নির্দেশ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আকবরকেই দেয়া হলো। আগেই বলেছি, আমাদের মধ্যে কোনো রকম Signal communication ছিল না। আকবর তার কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজেই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে সেই গভীর রাতে গলা সমান পানি ভেঙে বিল অতিক্রম করে আনোয়ারের অবস্থানে এসে পৌঁছায়। তখন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলছিল। সেই সঙ্গে হাল্কা অস্ত্রের অবিরাম গোলাগুলি। ভোর

হওয়ার আগেই আনোয়ারের অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার সমূহ শঙ্কা। ফিরে যাওয়ার নির্দেশ সময়মতো না পেলে আনোয়ার এবং তার কোম্পানি বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণকারীদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারতো। আনোয়ার ও আলফা কোম্পানির সঙ্কটময় অবস্থার কথা ভেবে আকবর তাদের পশ্চাপদসরণ নিশ্চিত করার জন্য কোনো রানার না পাঠিয়ে নিজেই এই দায়িত্বটি পালন করে। আলফা কোম্পানি একটি নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ছাতক এলাকায় ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবর— এই পাঁচদিন যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে দু'পক্ষেরই বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়। বলতে গেলে আমার তৃতীয় বেঙ্গলের একটি কোম্পানি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও এ যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রচার পাই। তাছাড়া সেবারই প্রথম একটি বড়ো ফোর্স নিয়ে অপারেশন করি আমরা, যার ফলে আমাদের যোদ্ধাদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে যায়। পাক বাহিনীও বুঝতে পারে, মুক্তিবাহিনী এখন অনেক সংগঠিত। তারা এখন আগের চেয়ে অধিক শক্তি নিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে এবং পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করার শক্তি অর্জন করেছে। এই যুদ্ধের পর আমরা ৫/৬ মাইল পিছিয়ে এসে বাঁশতলা সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের ভেতরেই বাংলাবাজারে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান গ্রহণ করি।

সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস টু সারেন্ডার'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কোনো অভিযানকেই ভারতীয় অথবা পাকিস্তানিরা কখনো সম্মানজনকভাবে চিত্রিত করে নি। তাদের কোনো গ্রন্থ বা রচনায় বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কৃতিত্বের কথাই স্বীকৃত হয় নি। পাকিস্তানিদের লেখা পড়লে মনে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কৃতিত্ব সবই ভারতীয় সেনাবাহিনীর। কিন্তু সিদ্দিক সালিক নামে পাকিস্তান আর্মির একজন ব্রিগেডিয়ার (তিনি কয়েক বছর আগে পাক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন) *'Witness to Surrender'* নামে একটা বই লিখেছেন, যেখানে ছাতক যুদ্ধের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সিদ্দিক সালিক ঢাকাস্থ আইএসপিআর-এ কর্মরত ছিলেন বলে যুদ্ধের খবরাখবর সম্পর্কে ভালোই অবগত ছিলেন। পাকিস্তানি এই লেখকের গোটা বইয়ে মুক্তিবাহিনীর মাত্র দুটো অভিযানের কথা স্থান পেয়েছে। তার একটি হলো ছাতক অভিযান, অন্যটি প্রথম বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণ। লেখক তাঁর বইতে লিখেছেন, আক্রমণকারীরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করতে পারলেও ছাতক শহর তাদের পাকিস্তানিদের হাতেই রয়ে গিয়েছিল। ছাতকের যুদ্ধ যে পাকিস্তানি হেড কোয়ার্টারে বড়ো ধরনের ধাক্কা দিয়েছিল, সিদ্দিক সালিকের বইয়ে তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় বাহিনী ছাতক শহর ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে আক্রমণ চালিয়েছিল। প্রচণ্ড হামলার

পর তৃতীয় বেঙ্গলের সহায়তায় তারা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি দখল করে নেয়। সিদ্দিক আরো লিখেছেন, এ আক্রমণ এতো প্রচণ্ড ছিল যে আমরা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ছেড়ে দিয়ে ছাতক শহরে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হই। পরে আমরা ৩১ পাঞ্জাব এবং ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের একটা রেজিমেন্ট নিয়ে কাউন্টার-অ্যাটাক করি। তিনদিন যুদ্ধের পর অবস্থানটি আবার আমাদের অধিকারে আসে। লেখক তাঁর বইতে সম্পূর্ণ সত্য তথ্য দিয়েছেন, শুধু ভুল করেছেন আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করতে। তিনি লিখেছেন, ৮৫ বিএসএফ এই আক্রমণ পরিচালনা করে এবং এতে তৃতীয় বেঙ্গল তাদের সাহায্য করেছিল মাত্র। প্রকৃত তথ্য এই যে, ভারতীয় সেনাসদস্যদের একজনও এই আক্রমণাভিযানের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এটি পুরোপুরিভাবেই তৃতীয় বেঙ্গল এবং ৫ নম্বর সেক্টরের তিনটি এফএফ কোম্পানির নিজস্ব অভিযান ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল আমরা ভারতীয়দের কিছু গোলাবর্ষণের সাহায্য নিয়েছিলাম।

ওসমানী ও জিয়া এলেন বাঁশতলায়

ছাতক অভিযানের ব্যর্থতার দায়িত্ব নির্ধারণ করতে ২০ অক্টোবর ওসমানী সাহেব বাঁশতলায় আসেন। তিনি ঢালাওভাবে আমার এবং অধীনস্থ অফিসারদের ওপর ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, কোলকাতা এবং শিলংয়ের পাহাড়-চূড়ায় বসে যারা এরকম একটি অবাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং আমরা এ অঞ্চলে পৌঁছানো মাত্র কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই অভিযানে যেতে বাধ্য করেছেন, ব্যর্থতার দায়িত্বভার তাদের ওপরে চাপানোই যুক্তিযুক্ত হবে। ওসমানী তখনকার মতো আর কিছু না বললেও পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে তৃতীয় বেঙ্গলের ওপর তার ঝাল ঝেড়েছেন বীরত্বসূচক পদক দেয়ার সময়। পদক বিতরণকালে তৃতীয় বেঙ্গলের অনেক যোগ্য সদস্যের প্রতি অন্যায়ভাবে বিমাতাসুলভ আচরণ প্রদর্শন করা হয়। একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, যা নাকি জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেখানে কেবল কিছুসংখ্যক যোদ্ধাকে খেতাব দেয়া কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা পর্যালোচনা এবং সেই সঙ্গে পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। এর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধারা বিভাজিত হয়েছিল। অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ ঘটনা অনুদ্ঘাটিত ও অবহেলিত রয়ে যায়। সেই সব ঘটনার নায়কদের সম্বন্ধে কীর্তিপত্র বা citations লেখার কেউ তো তখন ধারেকাছেও ছিলেন না! সেক্টর কমান্ডারদের হেড কোয়ার্টারগুলো সীমান্ত পাড়ের বড়ো শহরের চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তৃত রণক্ষেত্রে কোথায় কী ঘটছে, তার কতোটুকু সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছুতো?

পদক বিতরণের নামে এই প্রহসনে তৎকালীন সরকারের আস্থা ও বিশ্বাসের অমর্যাদা করে তৃতীয় বেঙ্গলের সদস্যদের আত্মত্যাগ, রক্তদান এবং

সার্বিক অবদানকে ওসমানী বিদ্বেষমূলকভাবে অবমূল্যায়ন করেন। এই প্রহসনের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান না করেও কেবল ওসমানী ও তাঁর নিয়োজিত নির্বাচকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে বহুসংখ্যক অফিসার খয়রাতি 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন। যুদ্ধের ময়দানে পালিত ভূমিকা বিবেচনা সেখানে অনুপস্থিত ও গৌণ, মুখ্য উপাদান ছিল গোষ্ঠী রাজনীতি ও তদবির।

ছাতকের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে আমাদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করার জন্য জেড ফোর্স কমান্ডার জিয়া বাঁশতলায় আসেন। জিয়াকে ওসমানীর সঙ্গে আমার বাদানুবাদের কথা খুলে বলাতে তিনি বললেন, 'You have done the right thing, I shall vindicate you and your battalion at an appropriate moment.'

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ এক ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি আমাকে লেখেন, 'Do convey my eternal gratitude and congratulation to your men for the fine performance at a very high cost during our War of Independence. You all must understand that 'truths' and 'facts' emerge after struggle for sometime, but they do come out definitely. I can assure you that I shall play my part for your battalion at the right moment and well.' কিন্তু কিছুই হলো না। জিয়াও তাঁর কথা রাখেন নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের সার্বিক অবদান অবহেলিত এবং অবমূল্যায়িতই রয়ে গেলো।

নবীর কোম্পানির পুনর্গঠন

ছাতক যুদ্ধের পর নবী তার অবস্থান থেকে সরে এসে শেলার মাইল পাঁচেক পুবে ভোলাগঞ্জ কোনিয়ারির পাশে অবস্থান নিয়েছিল। অক্টোবরের ১৯ তারিখের দিকে আমি নবীর নেতৃত্বাধীন ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানে যাই। উদ্দেশ্য নবীর কোম্পানির অভ্যন্তরীণ রদবদল ও পুনর্গঠন। দু'জন প্লাটুন কমান্ডারকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাঁশতলায় (Rear HQ) close করে রাখার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা মোকাবিলায় এই রদবদল খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। ব্যাটালিয়নের অভ্যন্তরীণ রদবদল এবং যুদ্ধাবস্থায় সেনাদের পদোন্নতি জাতীয় কাজ সিও-কেই করতে হয়। সারাদিন ভোলাগঞ্জ থেকে কোম্পানিটির পুনর্গঠন কাজ তদারকি করলাম।

জেনারেল গিলের কনফারেন্স

সন্ধ্যায় দু'জন রানার বাঁশতলা থেকে অ্যাডজুট্যান্ট আশরাফের বার্তা নিয়ে এলো। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় আমাকে শিলংয়ের ১০১ কমুনিকেশন জোনের জিওসির অফিসে অনুষ্ঠেয় conference-এ যোগ দিতে হবে। আমার

নির্দেশমতো আশরাফ শেলা বিওপি-তে রাত তিনটা নাগাদ একটি জিপ এবং প্রোটেকশন পার্টি তৈরি করে রাখলো। রাত দুটো নাগাদ ভোলাগঞ্জ থেকে রওনা হলাম। পায়ে হাঁটা পাহাড়ি রাস্তা। গন্তব্যের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জনমানবহীন এলাকা। চলার সময় পাহাড়ি বুনো লতাপাতা ও গাছের ছোট ছোট ডাল শরীরে এবং অনাবৃত মুখে আছড়ে পড়ছিল। যাই হোক, খুব দ্রুত হেঁটে আমি ও আমার সহযোদ্ধারা রাত চারটার কিছু আগে শেলা বিওপি-তে পৌঁছে যাই। সেখানে পৌঁছেই নতুন প্রোটেকশন পার্টি নিয়ে শিলংয়ের পথে যাত্রা শুরু করি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শিলংয়ের অবস্থান ৬ হাজার ফুট উঁচুতে। তাই শিলংয়ের যতোই কাছে যাচ্ছি, ততোই ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করলো। এক সময় মনে হলো শীতে জমে যাবো। আমরা আসছি সমতল ভূমি থেকে, কাজেই গায়ে সুতির একটা শার্ট মাত্র। শিলংয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এমন সময় মনে হলো, টুপ টুপ করে আমার মাথা ও ঘাড়ের কাছ থেকে কি যেন গাড়ির ভেতরে পড়লো। গাড়ি থামিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম কতোগুলো বড়ো কুল বরইয়ের মতো কি যেন পড়ে রয়েছে গাড়ির ভেতরে। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেলো, ওগুলো সব পেছো জোঁক। রক্ত খেয়ে ফুলে বরইয়ের মতো গোল হয়ে গেছে। শীতের তীব্রতায় ওরাও আমার শরীর ছেড়ে দিয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। একটা জোঁক তখনো চোখের একটু ওপরে লেগেছিল। আমার মুখ ও ঘাড় তখন সত্যিকার অর্থেই রক্তাক্ত। পাঁচটি জোঁক বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে পরম নিশ্চিন্তে আমার রক্ত চুষছিল। কিন্তু একটুও টের পাই নি।

হয়তো যুদ্ধের চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম বলে।

গোয়াইনঘাট অভিযানের আদেশ

যাই হোক, সময়মতো জেনারেল গিলের সামনে হাজির হলাম। তিনি বললেন, তোমার ব্যাটালিয়ন এখন দু'ভাগ করতে হবে। একভাগ অর্থাৎ দুই কোম্পানি থাকবে ছাতক-বাঁশতলা এলাকায়। বাকি দুই কোম্পানি নিয়ে তুমি যাবে ডাউকি সাব-সেক্টরে। তার আগে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। গোয়াইনঘাটে পাকসেনাদের অবস্থান আক্রমণ করবে তুমি। গোয়াইনঘাটের অবস্থান সিলেটের ডাউকি সীমান্ত থেকে মাইল দশেক দক্ষিণে, অর্থাৎ বাংলাদেশের অনেকটাই ভেতরে। গোয়াইনঘাটের উত্তরে আবার রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স, সেটা পাকিস্তানিদের খুবই শক্তিশালী একটা ঘাঁটি। গোয়াইনঘাটেও পাকিস্তানিদের বেশ শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

গোয়াইনঘাটে পিয়াইন নদীকে সামনে রেখে পাশে ডাউকি-রাধানগর-গোয়াইনঘাট সড়ক কভার করে পাক-ডিফেন্স। গোয়াইনঘাট হয়ে নদীর পাড় ধরে সোজা গেলে শালুটিকর এয়ারপোর্ট। এটাই সীমান্ত থেকে সিলেটে

যাওয়ার সংক্ষিপ্ততম রাস্তা। রাস্তাটা তখন পায়েহাঁটা পথ হলেও স্ট্র্যাটেজিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গিলের নির্দেশমতো ১৮ অক্টোবর দুটো কোম্পানি ক্যাপ্টেন মোহসীনের অধীনে রেখে গেলাম। মোহসীন তখন আমার টুআইসি। আলফা কোম্পানির কমান্ডার আনোয়ারকে চিকিৎসার জন্য শিলং পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। মার্চে সৈয়দপুর এলাকার পাকসেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়েছিল আনোয়ার। এতোদিন সুচিকিৎসা হয় নি বলে কষ্ট পাচ্ছিল সে। ওর জায়গায় কমান্ডার হলো সে. লে. মঞ্জুর। প্রসঙ্গত, ছাতক অপারেশন শেষে বাঁশতলায় ফিরে আসার পর আরো দু'জন সেনা অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা ছিল 'ফার্স্ট মূর্তি ব্যাচ' অর্থাৎ যুদ্ধকালীন সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ সমাপনকারী অফিসার সে. লে. মঞ্জুর এবং সে. লে. হোসেন (মঞ্জুর পরে মেজর অব., হোসেন পরে লে. কর্নেল, ১৯৮১-তে ফাঁসিতে নিহত)। এ দু'জনকে যথাক্রমে আলফা ও ব্রাভো কোম্পানিতে নিযুক্ত করা হয়। মূর্তি নামক স্থানে এদের প্রশিক্ষণ হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় মূর্তি কমিশন। এদের গ্রুপটাই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার।

অভিযানের প্রস্তুতি

মঞ্জুরের আলফা কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার নিয়ে প্রথমে গেলাম ভোলাগঞ্জ। সেখান থেকে ডেল্টা কোম্পানিসহ কোনাকুনিভাবে বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে মাইল পনেরো দূরবর্তী হাদারপাড়ায় গেলাম। সেখানে আমরা একটা কনসেনট্রেশন এরিয়ার মতো করলাম, অনেকটা হাইড-আউট ধরনের। এখানে আমাদের দুটো কোম্পানি আর ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারের মোট প্রায় পাঁচশ' সৈন্য। হাদারপাড়ায় আরো দুটো এফএফ কোম্পানি যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে। মোট প্রায় সাতশ' লোক নিয়ে একদিন একরাত সেখানে থাকলাম। এর মধ্যে গোয়াইনঘাটের পরিস্থিতি, রাস্তাঘাট সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। গোয়াইনঘাট তখনো বারো মাইল দূরে। সারা রাত হেঁটে খুব ভোরে পিয়াইন নদীর পারে পৌঁছুলাম আমরা। পৌঁছে দেখি, যাদের ওপর নৌকা যোগাড় করার দায়িত্ব ছিল, তারা নৌকা যোগাড় করতে পারে নি। অথচ এখবরটাও তারা আমাদের দেয় নি। পাহাড়ি নদী বলে অবশ্য পিয়াইন বেশি চওড়া নয়, বড়োজোর শ' দেড়েক ফুট ছিল এর প্রশস্ততা। নদীর তীর বরাবরই পাকিস্তানিদের অবস্থান। ওপারের একটা স্কুলে তাদের হেড কোয়ার্টার। স্কুলটার ছাদে মেশিনগান বসানো। কথা ছিল গোয়াইনঘাটকে মাইল দেড়েক উত্তরে রেখে নৌকায় নদী পার হবো। জায়গামতো গিয়ে নৌকা না পেয়ে তাই বিপদেই পড়ে গেলাম। এর মধ্যে সকাল হয়ে গেলো। সকাল হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানিরা আমাদের দেখে ফেলে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। দু'পক্ষের মধ্যে সমানে গোলাগুলি শুরু হয়ে

গেলো। আমরা পজিশনেই যেতে পারলাম না। নদী পার হয়ে তবে তো অ্যাটাক করতে হবে! অথচ ওপারে গিয়ে পজিশন নেয়ার আগেই শুরু হয়ে গেলো ফায়ারিং।

গোয়াইনঘাটের বিপর্যয়

লে. লে. মজুরের আলফা কোম্পানি ছিল সবার আগে। পাক আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো আমাদের। নবীর ডেল্টা কোম্পানিরও বেশির ভাগ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

রাত তিনটার দিকে আমরা যখন গোয়াইনঘাট এলাকায় গিয়ে পৌঁছই, তখন হঠাৎ করেই বাড়ি থেকে আজানের ধ্বনি উঠতে থাকে। অসময়ে আজান শুনে আমরা অবাক হয়ে যাই। এক বাড়ির আজান শুনে কিছুদূর পরপর বিভিন্ন বাড়ি থেকে আজান দেয়া হচ্ছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম, এভাবে আমাদের আগমনবার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছিল পাকসেনাদের কাছে। আর আজান দেয়া হচ্ছিল রাজাকারদের বাড়ি থেকে। কাজেই আচমকা আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের হতভম্ব করতে পারি নি আমরা, বরং আগে থেকেই সতর্ক থাকায় ওরাই আমাদেরকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেয়।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যে আলফা আর ডেল্টা দুটো কোম্পানিই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। ওই অবস্থাতেই পাকসেনাদের সঙ্গে আমাদের দিনভর গোলাগুলি চললো। আশপাশে ৫০/৬০ জন্য সৈন্য ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। যোগাযোগ যে করবো তারও উপায় নেই। যে-কোনো কারণেই হোক, ভারতীয়রা আমাদের সিগন্যাল সেট, ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার এসব প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জাম দেয় নি। পাকঅবস্থানের ওপর মেশিনগান আর তিন ইঞ্চি মর্টার চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। সেদিন আমাদের কাছে বেশকিছু মর্টারের গোলা ছিল। প্রায় পাঁচশ' সৈন্যের প্রতিটি হাত একটা করে গোলা বহন করছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতেই সমস্যা দেখা দিলো। মর্টারের গোলা দূরে থাক, সৈন্যদেরই পাত্তা নেই।

এক সময় দক্ষিণ দিক থেকে কিছু সৈন্যকে বিলের ভেতর দিয়ে পানি ভেঙে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছাকাছি এলে বোঝা গেলো তারা আলফা কোম্পানির সৈন্য। ফায়ার কাভার দিয়ে নিয়ে এলাম তাদেরকে। সারাদিন-সারারাত যুদ্ধ করে এভাবে পাকসেনাদের সামনে থেকে বাকি লোকদের উদ্ধার করতে হয়। দুপুরের দিকে মাথার ওপর দুটো ফিক্সড উইং প্লেন (ছোট প্রশিক্ষণ বিমান) এসে আমাদের ওপর মেশিনগানের গুলি চালাতে লাগলো। কিন্তু প্লেন দুটো এতো উঁচুতে ছিল যে তেমন একটা সুবিধা করতে পারে নি। তবে আমাদের সৈন্যদের মধ্যে তা সাময়িকভাবে কিছুটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা নদীর এপারে বাঁধমতো একটা উঁচু জায়গার আড়ালে ছিলাম

বলে রক্ষা। কেবল স্কুলের ছাদে বসানো পাকসেনাদের মেশিনগানটাই সমস্যা করছিল। এর মধ্যে সবাইকে পিছিয়ে এসে পশ্চাৎবর্তী একটি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। আমাদের কোম্পানিগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয়। ডেল্‌টার নবী ও গুটিকয় সৈন্য ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। এফএফ কোম্পানিগুলোও উধাও। আমার নিজের হেড কোয়ার্টারের শ'খানেক সৈন্যের বেশির ভাগেরই খবর নেই। কয়েকজন জেসিও এবং এনসিওকে নিয়ে শত্রুর একেবারে সামনে থেকে বেশ ঝুঁকি নিয়ে কতক সৈন্যকে উদ্ধার করলাম। এরপর ধীরে ধীরে সবাই পেছনের একটা গ্রামে জড়ো হলাম। গ্রামটার নাম লুনি। এ যুদ্ধে আমাদের এমনই দুর্দশা হয় যে, জনা পনেরো সৈন্যকে শেষ পর্যন্ত পেলামই না। সব মিলিয়ে গোয়াইনঘাট অপারেশন আমাদের জন্য একটা বিপর্যয়ই ছিল বলতে হবে। এখানকার পাকঅবস্থানটি ছিল খুবই সুরক্ষিত। মিত্র বাহিনীর কমান্ডাররা দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় বসে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে আর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে পাওয়া ভাসা ভাসা তথ্যের ওপর নির্ভর করেই আমাদের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করার নির্দেশ দিতো। ফলে যেখানে বলা হতো পাকবাহিনীর একটা সেকশন আছে, সেখানে গিয়ে দেখা যেতো একটা প্লাটুন বসে আছে, আর প্লাটুন বললে হয়তো দেখা যেতো পুরোদস্তুর একটা কোম্পানি সেখানে উপস্থিত। গোয়াইনঘাটের বিপর্যয়ের কারণও তাই। আমরা পাকসেনাদের অবস্থান সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতাম না।

মিত্র বাহিনীর সঙ্গে মতবিরোধ

মিত্র বাহিনীর সেনানায়কের সঙ্গে ছাতক যুদ্ধের সময় থেকেই মতবিরোধ দেখা দেয় আমার। আমি বলেছিলাম, কনভেনশনাল অ্যাটাকে যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। অন্তত বর্তমান পর্যায়ে আমাদের সেই দক্ষতা অর্জিত হয় নি। প্রয়োজনীয় যুদ্ধোপকরণও নেই বললেই চলে। আর প্রথাগত আক্রমণ করতে গেলে প্রতিপক্ষের চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য যেমন থাকতে হবে, তেমনি শত্রুর চেয়ে তিনগুণ বেশি ক্যাজুয়ালটি স্বীকার করার প্রস্তুতি থাকতে হবে। কিন্তু এতো বেশি ক্যাজুয়ালটি মেনে নেয়ার অবস্থায় আমরা নেই। কারণ রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা বলতে গেলে কিছুই নেই। নিয়মিত বাহিনী হিসেবে পাকবাহিনীর সেটা ভালো মতোই আছে। এসব ব্যাপারে আমাদের সেক্টর কমান্ডারদের প্রায় সবাই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে গেছেন। আর না এড়িয়েই-বা কি করবেন? আমাদের সেক্টরগুলোর বিপরীতে ভারতীয় যে সেক্টরগুলো গঠিত হয়েছিল, তার কমান্ডারদের একজন ছাড়া সবাই ছিল কর্মরত ব্রিগেডিয়ার, অবশিষ্ট জনের র‍্যাঙ্কও ছিল মেজর জেনারেল। আর আমাদের সেক্টর কমান্ডাররা একেকজন মেজর, ক্যাপ্টেন আর এয়ারফোর্সের

উইং কমান্ডার। পৃথিবীর কোনো আর্মিই পারতপক্ষে ছাতক অভিযানের মতো আহম্মকি অপারেশন করবে না। প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় পৌছানো মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে অ্যাটাক করার পরিকল্পনা কেউই সমর্থন করবে না।

যাই হোক, আমরা পিছিয়ে লুনি গ্রামে প্রতিরক্ষাগত অবস্থান নিলাম। আস্তে আস্তে সবাই সেখানে জড়ো হলো। লুনির অবস্থান রাধানগর আর গোয়াইনঘাটের মধ্যে, একটু পশ্চিমে। ঐ অবস্থানে থেকে কয়েকদিন প্রতিরোধ যুদ্ধ করলাম আমরা। পাকসেনারা মাঝেমধ্যে ফাইটিং প্যাট্রল পাঠিয়ে ছোটোখাটো হামলা চালায়, আমরা ওদের প্রতিহত করি। এমনি ধরনের সংঘর্ষ চলে– কোনো বড়োসড়ো লড়াই হয় নি।

রাধানগর এলাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান গ্রহণ

গোয়াইনঘাট আক্রমণে (২৪/২৫ অক্টোবর) তৃতীয় বেঙ্গলের বিপর্যয়ের পর জেনারেল গিল আমাকে রাধানগরের পাকিস্তানি সেনাদলের শক্তিশালী প্রতিরক্ষার বিপরীতে অবস্থানরত এফএফ কোম্পানিগুলোর শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানিকে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করার পরামর্শ দিলেন। মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি রাধানগর পাক ডিফেন্সের মুখোমুখি বাঙ্কারে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। জুলাই-আগস্ট মাস থেকেই এফএফ কোম্পানিগুলো মোটামুটি অর্ধচন্দ্রাকারে পাক অবস্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। ভারতীয় সাব-সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাজ সিং জেনারেল গিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলের অঘোষিত কমান্ডার হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কোম্পানিগুলো পরিচালনা করছিলেন। এখানে প্রায় প্রতিদিনই ছোটোখাটো আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের ঘটনা ঘটছিল। সেই সঙ্গে বেড়ে চলছিল দু'পক্ষের হতাহতের সংখ্যাও। ছোটখেল গ্রাম ছিল রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সের হেড কোয়ার্টার। গোয়াইনঘাটের অবস্থান এর প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

২৭ অক্টোবর আলফা কোম্পানিকে কাফাউরা এবং ডেল্টা কোম্পানিকে লুনি গ্রামে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলাম। কাফাউরা গ্রামটি রাধানগর-গোয়াইনঘাট রাস্তার উত্তর-পূর্ব এবং লুনি গ্রামটি একই রাস্তার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এফএফ কোম্পানিগুলোকে সাহায্য করতে আমার কোম্পানি দুটো অবস্থান নেয়াতে রাধানগরে অবস্থিত পাক সেনাদল তিনদিক থেকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়ে যায়। একমাত্র দক্ষিণ দিকটাই খোলা ছিল। সেদিক দিয়ে গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাস্তা। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি নবীর ডেল্টা কোম্পানির অবস্থান লুনি গ্রামের প্রতিরক্ষা আরো জোরদার করার জন্য ইকো এবং ব্রাভো কোম্পানির দুটো প্লাটুন বাংলাবাজার (শেলা-ছাতকের রাস্তার ওপর) থেকে আনিয়ে নবীর কমান্ডে ন্যস্ত করেছিলাম। এর ফলে রাধানগর

রৌমারী মুক্তাঞ্চলে [illegible]   ছবি : হারুন হাবীব

রৌমারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছবি তুলছেন এনবিসি-টেলিভিশন টিমের নেতা রবার্ট রজার্স   ছবি : হারুন হাবীব

TENTATIVE CHARGE SHEET

The accused No. BA-6924 Temporary/Colonel Shaffat Jamil BB, Ex-Commander 46 Brigade, is Charged with :-

First Charge
BAA Sec 31(a)

Conspiring with other persons to cause a mutiny in the military forces of Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment between night 2nd and 3rd November 1975, conspired along with late Brigadier Khaled Mosharraf Ex-Chief of General Staff, certain officers of Bangladesh Air Force and some elements of all ranks of his Brigade to cause a mutiny in the Army to oust the set up of the Bangladesh Army and the Government of the Peoples Republic of Bangladesh.

Second Charge
BAA Sec 31(a)

Joining in a mutiny in the military forces of Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment between night 2nd and 3rd November 1975, Joined in mutiny along with late Brigadier Khaled Mosharaf Ex Chief of General Staff, late Colonel Khandokar Nazmul Huda Ex Commander 72 Brigade, late Lieutenant Colonel Hyder, some elements of Bangladesh Army and some officers of Bangladesh Air Force against prevailling set up of the Army and the State and thereby forcibly obtained resignation of the Chief of the Army Staff and the President of the Peoples Republic of Bangladesh.

Third Charge
BAA Sec 31(a)

Joining in a mutiny in the military forces of Bangladesh,

in that he,

at Dacca Cantonment on 4th November 1975 in Company with other officers went to the Bangobhaban in a mutinous spirit and forced the Ex President Khandokar Mushtaq Ahmed to appoint late Brigadier Khaled Musharaf as the Chief of Army Staff with promotion and resign his Presidentship of the Country.

Forth Charge
BAA Sec 31(c)

Knowing the existance of a mutiny in the Bangladesh Army and not without reasonable delay giving information there of to other superior officers,

in that he,

at Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975 having been known about the existence of usurping in the Army Commanded by late Brigadier Khaled Musharaf in mutinous way did not make any efforts to communicate the information to his superior officers.

Fifth Charge
BAA Sec 55

An act to the prejudice to good order and military discipline,

in that he,

at Dacca Cantonment on 2nd November 1975 recalled from duty SS-15 Major Nazrul Islam Bhuiyan 2 East Bengal Regiment from Chittagong through No. SS-85 Temporary Captain A B Tajul Islam on a false pretext of serious illness of his mother where as it was not so.

Contd. . . .P/2

খোন্দকার মোশতাকের অবৈধ সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টার দায়ে লেখকের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত চার্জশিট. অভিযোগের প্রথম চারটি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ

<u>Sixth Charge</u>
BAA Sec 55

An act to the prejudice of good order and military discipline,

in that he,
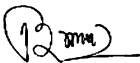
At Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975 ordered BSS-7766 Major Abdullah Ahmed Musa, Signal officer 46 Brigade through his Brigade Major BSS-10691 Temporary Major Hafizuddin Ahmed BB to seize the control of civil Telephone exchange by force and destroy the installation thereby intended to cause destruction to government property.

<u>Seventh Charge</u>
BAA Sec 52

Behaving in a manner unbecoming his position and character expected of him,

in that he,

at Dacca Cantonment on night 2nd and 3rd November 1975 as Commander of 46 Brigade ordered Infantry battalions of his Brigade to stand to and deployed some of its Company in and around Dacca Cantonment on a false pretext of clash between the elements of 1 East Bengal and 1 Bengal Lancers at Bangobhaban and thereby behaved in a manner not expected of his position and character.

Lieutenant Colonel
Commander Log Area
(Muhammad Abdul Hamid)

DACCA,
14 January, 1975

Headquarter's 'Z' Force

No. ....

Date 9 May 72

Dear Safaat,

My love and best wishes to yourself; regards to Bhabi and love to the children. I am confident this letter shall find you all in excellent health and spirit.

Many thanks for the piece of 'history'. It shall be very useful.

I am sure you all are very well settled and prospering in all directions. Please do convey my deep love to the other officers and sincere regards to the families. Do convey my eternal gratitude and congratulations to your men for the fine performance at a very

Headquarter's 'Z' Force

No. ....

Date ....

high cost during our war of independence. You all must understand that 'truths' and 'facts' emerge after struggle for sometime, but they do come out definitely. I can assure you that I shall play my part for your Battalion at the right moment and well.

Please do let us know if HQ 'Z' Force can be of any use and service to you. It shall be a pleasure.

Please do reply.

With regards & best wishes

Yours Sincerely

[illegible signature]

যুদ্ধ-শেষে লেখকের উদ্দেশে জেড ফোর্স অধিনায়ক মেজর জিয়ার পত্র, এখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধে তৃতীয় বেঙ্গলের ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়নের স্বীকার ব্যক্ত করেছিলেন

পুরোপুরিভাবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। এই অবরোধ ভাঙার কাজ করার জন্য পাকসেনারা ২৮ অক্টোবর থেকে প্রায় প্রতিদিন লুনি এবং কাকাউরা গ্রামে হামলা চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে আর্টিলারির গোলাবর্ষণও অব্যাহত রাখে। রাধানগরে এক কোম্পানি টোচি স্কাউটস এবং ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য অবস্থান করছিল। আগেই বলেছি পাকসেনাদের হেড কোয়ার্টার ছিল রাধানগরের আধ মাইল দক্ষিণে ছোটখেল গ্রামে। গোয়াইনঘাট যাওয়ার রাস্তাটি ছোটখেলের প্রায় লাগোয়া। নভেম্বরের মাঝামাঝি ডেল্‌টা কোম্পানি রাধানগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নিকটবর্তী দুয়ারিখেল ও গোরা নামের দু'টি গ্রাম দখল করে নেয়। ফলে পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে প্রায় প্রতিদিন ডেল্‌টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে হামলা চালাতে থাকে। এতে দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলেও পাকসেনারা ডেল্‌টা কোম্পানিকে হটাতে পারে নি।

কর্নেল রাজ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি

২১ নভেম্বর মুক্তিবাহিনীকে মিত্রবাহিনীর অধীনস্থ করা হয়। তারপরেই শুরু হলো কর্নেল রাজ সিংয়ের অযাচিত হুকুমদারি। তিনি আমার অধীনস্থ কোম্পানি কমান্ডারদের সরাসরি নির্দেশ দিতে শুরু করলেন। এক সময় তারা আমার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে। রাজ সিংকে একদিন ডাউকিতে বিএসএফ-এর বিওপি সংলগ্ন এলাকায় পেয়ে ধরলাম। তাকে সরাসরি বললাম, 'You will not communicate to any one directly under my command without my permission. You must remember that I have taken up arms to liberate my country from an occupation army by revolting from a disciplined army leading from the front. In the process, I had to arrest my own commanding officer. Please do not try to encroach on my command in future.' রাজ সিংকে আরো বললাম, আগামীতে আবার এরকম করলে সৈন্যদেরকে নিয়ে বাংলাদেশের অনেক ভেতরে অবস্থান নেবো আমি। তারপর সে তার অনধিকার চর্চার ফল বুঝবে! কারণ আমাদেরকে খেপিয়ে দেয়ার জন্য উর্ধ্বতন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে নিশ্চিতভাবেই ধরে বসবে। কর্নেল রাজ সিং এরকম কথা শোনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আমার কথায় মনে হলো খানিকটা ভড়কে গেলেন তিনি। এতে করে কাজ হলো। মনে মনে আমার ওপর খেপে থাকলেও তার দৌরাত্ম্য কিছুটা কমলো।

রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণ : প্রথম পর্যায়

২৬ নভেম্বর জেনারেল গিল অপারেশনাল ব্রিফিংয়ের জন্য ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাঠালেন আমাকে। সেদিনই সন্ধ্যায় ডাউকিতে গেলাম। জেনারেল গিল আমাকে জানালেন, ভোর রাতে ৫/৫ গুর্খা

রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি রাধানগর এবং একটি কোম্পানি একই সময় ছোটখেল আক্রমণ করবে। আক্রমণের আগে একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট শত্রুর অবস্থান দুটোর ওপর গোলাবর্ষণ করবে। গিল বললেন, তোমার থার্ড বেঙ্গলের দুই কোম্পানি যার যার অবস্থানে থেকে Assault করার পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত ফায়ার সাপোর্ট দেবে। এছাড়া গুর্খাদের FUP-র (Forming Up Place, যেখান থেকে সরাসরি হামলা শুরু করা হয়) নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে তোমার সৈন্যরা। FUP সাধারণত শত্রু অবস্থান থেকে ৬শ'/৮শ' গজ দূরে রাখা হয়। আমার মনে হলো, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে সম্পূর্ণ একটি প্রথাগত (conventional) আক্রমণ পরিচালিত হতে চলেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কোনো ভারতীয় পদাতিক ব্যাটালিয়নের অংশগ্রহণ এটিই প্রথম।

বীরের জাতি গুর্খা

পাঠকের অবগতির জন্য গুর্খা রেজিমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। গুর্খারা হিমালয়ের এক পাহাড়ি উপজাতি। হাজার বছরের যুদ্ধের ইতিহাস এদের। আনুগত্য ও সাহসিকতা গুর্খাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। লড়াকু জাতি হিসেবে এদের পরিচিতি পৃথিবীর সর্বত্র। গুর্খারা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বিনয়ী। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। অসংখ্য VC (Victoria Cross) এদের বীরদের গলার মালা হয়েছে। এখনো কয়েকটি দেশে গুর্খারা Mercenary হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ভারতীয়, বৃটিশ ও ব্রুনাই সেনাবাহিনী। মাতৃভূমি নেপালের সেনাবাহিনীতে তো রয়েছেই। আশির দশকে দক্ষিণ আমেরিকার ফকল্যান্ড-যুদ্ধে বৃটিশ সেনাবাহিনী একটি গুর্খা রেজিমেন্টকে তাদের আক্রমণের বর্শাফলক হিসেবে ব্যবহার করায় তা নেপালের সঙ্গে আর্জেন্টিনার একটি কূটনৈতিক যুদ্ধের সূচনা করে। ফকল্যান্ডেও গুর্খারা তাদের ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে ছাড়ে। বৃটিশরা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ঐ যুদ্ধে জিতে যায়।

এহেন গুর্খাদের ৫/৫ রেজিমেন্ট আমাদের সাহায্য করার জন্য রাধানগর ও ছোটখেল আক্রমণে যাচ্ছে। সবারই মনোবল তখন তুঙ্গে। মনে হলো চূড়ান্ত বিজয়ের আর বেশি দেরি নেই।

যুদ্ধ হলো শুরু

৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের সিও লে. কর্নেল রাওয়ের সঙ্গে শেষ রাতে তাদের আক্রমণের FUP পর্যন্ত গেলাম। নির্ধারিত সময়ের ১০ মিনিট আগ থেকেই রাধানগর ও ছোটখেলে পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা অবস্থানগুলোর ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হলো। সেই সঙ্গে গর্জে উঠলো আমার আলফা ও ডেল্টা

কোম্পানির মেশিনগানগুলো। মাঝে মাঝে আমাদের ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানগুলো থেকেও গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। ভারতীয় কামান এবং আমার দুই কোম্পানির মেশিনগানগুলো পরিকল্পনা মতো এই পর্যায়ে তাদের ফায়ার কভার বন্ধ করে দিলো। এবার পাকবাহিনীর গোলাবর্ষণের পালা। গুর্খারা Assault line বানিয়ে বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে পাকসেনাদলের অবস্থানগুলোর দিকে এগুচ্ছিল। তাদের কণ্ঠে রণধ্বনি 'আয়ো-গুর্খালি', যার অর্থ গুর্খারা এসে গেছে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুর্খাদের হামলার ফলাফল আসতে শুরু করলো। অনেক আহত গুর্খা সেনাকে সরিয়ে আনতে দেখলাম। যে কোম্পানিগুলো রাধানগর আক্রমণে গিয়েছিল হতাহতের সংখ্যা তাদেরই বেশি। গুর্খাদের একটি কোম্পানি ওখানকার একটা মেশিনগানের Line of Fire-এ পড়ে গিয়েছিল। যার ফলে তারা আর এগুতেই পারে নি। এই কোম্পানিটি প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অন্য কোম্পানির অবস্থাও তথৈবচ। তারাও আর এগুতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিয়ে পেছনে ফিরে এলো।

ছোটখেল দখল এবং আবার হাতছাড়া

ওদিকে ছোটখেলের পাক অবস্থানটি গুর্খারা দখল করে ফেললো। সেখানে অবস্থানরত পাকসেনারা পালিয়ে গিয়ে দূরের কাশবনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিলো। মাত্র আধ ঘণ্টার ব্যবধানে এই দুই জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণে গুর্খাদের ৪ জন অফিসার ও ৬৭ জন বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের সদস্য হতাহত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তথা গুর্খাদের এই চরম আত্মত্যাগ আমরা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমরা তাদের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

ছোটখেল গুর্খাদের হাতে এলেও রাধানগর সম্পূর্ণভাবে পাকবাহিনীর দখলেই রয়ে গেলো। পাকসেনাদেরকে একচুল পরিমাণও টলানো গেলো না এই আক্রমণাভিযানে। গুর্খাদের আক্রমণের প্রচণ্ডতা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে পাকসেনারা ডেল্টা কোম্পানির অবস্থানগুলোতে প্রবল গোলাবর্ষণ শুরু করে দেয়। এতে আমাদেরও কয়েকজন সৈন্য হতাহত হলো।

ছোটখেলের অবস্থান ছিল রাধানগরের পেছনে এবং এটিই ছিল পাকসেনাদের মূল প্রতিরক্ষা কেন্দ্র। ছোটখেল হাতছাড়া হওয়াতে পাকবাহিনী বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ, গোয়াইনঘাট যাওয়ার তাদের একমাত্র রাস্তাটি এখন বন্ধ। এজন্য প্রায় মরিয়া হয়েই ঘণ্টাতিনেক পর পাকবাহিনী অতিরিক্ত সৈন্য সমাবেশ করে আরো সংগঠিত হয়ে আর্টিলারির গোলাবর্ষণের সহায়তায় গুর্খাদের ছোটখেল অবস্থানে প্রতি-আক্রমণ করলো। প্রায় কুড়ি মিনিটের এই প্রচণ্ড আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে গুর্খারা ছোটখেলের অবস্থান ছেড়ে দিয়ে লুনিতে

অবস্থানরত আমার ডেল্‌টা কোম্পানির সঙ্গে আশ্রয় নিলো। পাকবাহিনী ছোটখেল গ্রামে তাদের অবস্থান পুনর্প্রতিষ্ঠা করে ফেললো। এই পাল্টা হামলাতেও দু'পক্ষের প্রচুর হতাহত হলো।

হতাশায় কালো ছায়া

আমরা সবাই খুব মুষড়ে পড়লাম ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের এই বিপর্যয়ে। চারদিকে হতাশাব্যঞ্জক একটা অবস্থা। মিত্র ও মুক্তিবাহিনীর মনোবল একেবারে বিপর্যস্ত। এদিকে পাকসেনারা তাদের প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে নতুন উদ্যমে ডেল্‌টা কোম্পানির দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামের অবস্থানগুলোতে তীব্র আক্রমণ শুরু করলো। কামানের গোলার ছত্রছায়ায় তারা এই দুই অবস্থানে হামলা চালালো। বিকেলের দিকে দুয়ারিখেলে অবস্থিত ডেল্‌টা কোম্পানির প্লাটুনটি লুনি গ্রামে পশ্চাদপসরণ করে সেখানকার অবস্থানটির শক্তি বৃদ্ধি করলো। এর মধ্যে খবর এলো রাত আটটায় ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে জেনারেল গিলের অপারেশনাল ব্রিফিং হবে। আমাকে যেতে হবে।

রাধানগর-ছোটখেল আক্রমণ : দ্বিতীয় পর্যায়

যথাসময়ে ডাউকি বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছুলাম। মিত্রবাহিনীর অন্যান্য অফিসারও যথারীতি উপস্থিত। সবাই বিমর্ষ। পরিস্থিতি থমথমে। জেনারেল গিল ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের বিপর্যয়ের জন্য কাউকেই দোষারোপ করলেন না। তিনি শুধু বললেন, ছোটখেল অবস্থানটি ধরে রাখতে না পারার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। এই অবস্থানটি দখল করতে গিয়ে গুর্খাদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছিল। জেনারেল গিল গুর্খা রেজিমেন্টের সিও কর্নেল রাওকে এজন্য সহানুভূতি জানালেন। তারপর সেদিনই (২৮ নভেম্বর) ভোররাত সাড়ে চারটায় দুই কোম্পানি সৈন্য নিয়ে আবারো রাধানগর আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন তাকে। তাদের আক্রমণে সাহায্যকারী হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি আর্টিলারি রেজিমেন্ট গোলাবর্ষণ করবে। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর তিনটি এফএফ কোম্পানি এবং তৃতীয় বেঙ্গলের আলফা কোম্পানি নিজ নিজ প্রতিরক্ষা অবস্থান থেকে গুর্খাদের ফায়ার সাপোর্ট দেবে।

এরপর তিনি আমাকে লুনি, দুয়ারিখেল ও গোরা গ্রামে অবস্থানরত তৃতীয় বেঙ্গলের সকল সেনা-সদস্যকে সংগঠিত করে একযোগে ছোটখেল আক্রমণ করে সেটা দখল করার নির্দেশ দিলেন। তবে আমাদের কোনো আর্টিলারি সাপোর্ট দেয়া হবে না বলে গিল জানালেন। অর্থাৎ কোনো ফায়ার সাপোর্ট ছাড়াই আমাদের একটি প্রথাগত আক্রমণ পরিচালনা করতে হবে, যাকে Silent attack বা নীরব আক্রমণ বলা চলে।

ঐ গ্রাম তিনটিতে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি এবং আরো দুটো প্লাটুন অবস্থান করছিল। অপারেশনের অর্ডার নিয়ে রাত প্রায় একটার দিকে আমি নবীর অবস্থানে পৌঁছুলাম। গোরা গ্রামে তখনো থেমে থেমে দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি চলছিল। দুয়ারিখেল যে এরি মধ্যে পাকসেনাদের দখলে চলে গেছে সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সন্ধ্যার আগে সেখানে অবস্থানরত প্লাটুনটি পশ্চাদপসরণ করে লুনি গ্রামে অবস্থানরত ডেল্টা কোম্পানির সঙ্গে একত্র হয়।

নবীর বাঙ্কারে বসেই সব প্লাটুন কমান্ডারকে খবর পাঠালাম। তারা এলে গিলের নির্দেশের কথা জানালাম। প্রায় সবাই একবাক্যে এই আক্রমণ কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রাখার কথা বললো। তাদের যুক্তি, গত প্রায় দেড় মাস ধরে অনবরত পাল্টাপাল্টি যুদ্ধ করে আমাদের সেনা-সদস্যরা খুবই পরিশ্রান্ত। অনেকেই আহত অথবা নিখোঁজ। সৈন্যদের খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমতো সরবরাহ করা যাচ্ছে না। ফলে অনেক সময় অভুক্ত থেকেই তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কয়েকদিনের বিশ্রামের পরই এরকম একটা আক্রমণে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে বলে প্লাটুন কমান্ডাররা অভিমত ব্যক্ত করলো। তাদের বক্তব্য যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। তবুও আমাদের এই আক্রমণে যেতেই হবে। আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য বিদেশী গুর্খারা আবারো রাধানগর আক্রমণে যাচ্ছে আর আমরা আক্রমণ স্থগিত রাখার জন্য যুক্তির অবতারণা করছি! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য বললাম, কোম্পানি কমান্ডার লে. নবীর সঙ্গে আমিও এই আক্রমণে অংশ নেবো। রাত চারটার মধ্যে সবাইকে নবীর বাঙ্কারের কাছে নিচু জমিটায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলাম।

তৃতীয় বেঙ্গলের ছোটখেল দখল

নবীর অবস্থানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নেয়ার পর বের হয়ে দেখলাম, ডেল্টা কোম্পানির সদস্যরা আক্রমণে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। এখন নির্দেশের পালা। FUP-র উদ্দেশে রওনা হলাম। এক সারিতে প্রায় একশো পঞ্চাশজন যোদ্ধা। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেই রাধানগরের ওপর মিত্রবাহিনীর কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পর আমরা Extended line-এ ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। লাইনের একেবারে বাঁয়ে ছিলাম আমি। মাঝখানে কোম্পানি কমান্ডার লে. নবী। শত্রুর অবস্থান আর মাত্র তিনশো গজ দূরে। 'জয় বাংলা', 'ইয়া হায়দার', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে চারদিকে কাঁপিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানি বেয়নেট উঁচিয়ে ফায়ার করতে করতে শত্রু অবস্থানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কয়েকটি বাঙ্কারে রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধ হলো। ডেল্টা কোম্পানির সৈন্যরা তখন এক অজেয়, অপ্রতিরোধ্য শক্তি। কোনো বাধাই

তাদেরকে আটকে রাখতে পারছে না। মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে ছোটখেলের শত্রু অবস্থানগুলোর পতন হলো। গুর্খারা যেই অবস্থান দখলের লড়াইয়ে মাত্র একদিন আগে পরাজিত হয়েছিল, আজ সেটা আমাদের হাতের মুঠোয়। তৃতীয় বেঙ্গলের ডেল্‌টা কোম্পানি প্রমাণ করলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের যোদ্ধারা বিশ্বের অন্য যে-কোনো রেজিমেন্টের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। অতুলনীয় তাদের সাহস, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম।

পাকসেনারা পশ্চাদপসরণ করে দূরের কাশবনের আড়ালে পালিয়ে গেলো। তাদের বেশ কয়েকজন আমাদের হাতে ধরা পড়ে। গ্রামের সর্বত্র পাকিস্তানি সৈন্যদের মৃতদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। ছোটখেল দখলের পর পাকসেনাদের প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ আর খাদ্যসামগ্রী ডেল্‌টা কোম্পানির হাতে আসে, যা দিয়ে অন্তত কয়েক মাস যুদ্ধ করা সম্ভব। পাকসেনাদের পরিত্যক্ত বাঙ্কারগুলোতে চারজন ধর্ষিত মহিলার লাশ পাওয়া গেলো। অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর বর্বর পাকসেনারা পালানোর সময় তাদেরকে হত্যা করে যায়।

আমি আহত হলাম

বিজয় আনন্দের আতিশয্যে কয়েকজন সৈন্য কয়েকটা খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। জ্বলন্ত খড়ের গাদার আগুনে এলাকাটা আরো আলোকিত হয়ে উঠলো। আমি পাকসেনাদের একটি বাঙ্কারের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরটা দেখছি। বালির বস্তা, বাঁশ, ভারি কাঠ দিয়ে তৈরি বাঙ্কারগুলো। মর্টারের শেলও ওগুলোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না বলে মনে হলো। চারদিকে তখনো বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলছে। আগুনের আলো লক্ষ্য করে পাকসেনারা দূর থেকে গুলি ছুঁড়ছিল। হঠাৎ করেই ডান কোমরে প্রচণ্ড এক আঘাত পেয়ে কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে গেলাম আমি। উঠতে চেষ্টা করেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম গুলিবিদ্ধ হয়েছি। শুয়ে থেকেই নড়াচড়া করে বুঝলাম হাড় ভাঙে নি। বুলেটটা ভেতরেই রয়ে গিয়েছিল। প্রবল যন্ত্রণা হচ্ছিল এ সময়। আমার ব্যাটালিয়নের ডাক্তার ওয়াহিদ তখন লুনিতে। কয়েকজন সহযোদ্ধা আমাকে ধরাধরি করে তার কাছে নিয়ে গেলো। আমার আগে আরো চারজন আহত সৈন্যকে সেখানে আনা হয়েছে। ওয়াহিদ সবাইকে ফার্স্ট এইড দিলো। তীব্র যন্ত্রণা কমানোর জন্য আমাকে পেথেড্রিন ইঞ্জেকশন দেয়া হলো। সেই অবস্থায় একটা চিঠিতে নবীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম। পাল্টা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে লিখলাম ওকে। এই অসাধারণ বিজয়গৌরব যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও ধরে রাখার নির্দেশ দিলাম। আরো বললাম, আমার আহত হওয়ার কথা যেন সৈন্যরা জানতে না পারে। কারণ, তাহলে তাদের মনোবল

ক্ষুণ্ন হতে পারে। আহত অবস্থায় চিঠিটা লিখি বলে হস্তাক্ষর খুব খারাপ হয়েছিল। ইংরেজিও হয়তো দু'একটা ভুল হয়ে থাকতে পারে। চিঠিটা খুব সম্ভব নবীর কাছে এখনো আছে। ঐ সময় আমার স্ত্রীকেও একটা চিঠি লিখি। সে তখন ব্যাটালিয়নের LOB-র সঙ্গে বাঁশতলার জঙ্গলে অবস্থান করছিলো। তারা যাতে কোনো দুশ্চিন্তা না করে সে জন্যই চিঠিটা লেখা।

শিলং মিলিটারি হাসপাতালে

বেলা দশটার দিকে কয়েকজন সহযোদ্ধা স্ট্রেচারে করে আমাকে ডাউকি সীমান্তে নিয়ে গেলো। সঙ্গে আহত অপর চারজন সৈন্য। সীমান্তের কাছে পৌছে দেখলাম, খোলা একটা জায়গায় কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে জেনারেল গিল দাঁড়িয়ে আছেন। একটু দূরে তাঁর হেলিকপ্টার। যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে এসেছেন তিনি। তাঁকে ছোটখেল যুদ্ধে আমাদের সাফল্যের সংবাদ দিলাম। ছোটখেল দখলের বিবরণ শুনে গিল উল্লসিত হয়ে অভিনন্দন জানালেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, গুর্খারা রাধানগরে দ্বিতীয়বারের মতো পর্যুদস্ত হয়েছে। এবারও প্রচুর হতাহত হয়েছে তাদের পক্ষে।

গিল তাঁর হেলিকপ্টারে করে আমাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। গিলের হেলিকপ্টার চালক অন্য আহত সহযোদ্ধাসহ আমাকে তুলে নিয়ে শিলং মিলিটারি হাসপাতালে নামিয়ে দেয়। হাসপাতালে পৌছুই বেলা বারোটার দিকে। সেখানে গুর্খা রেজিমেন্টের একজন জেসিওর সঙ্গে দেখা হলো। রাধানগর অপারেশনে তার একটা হাত উড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললো, 'স্যার, আপ ভি ইধার আ গিয়া।'

দুপুরের দিকে হাসপাতালে পৌছুলেও প্রায় কুড়ি ঘণ্টা পর অপারেশন টেবিলে তোলা হয় আমাকে। ২৬ নভেম্বরের যুদ্ধে আহত গুর্খাদের disposal করতেই এতো সময় লেগে যায়। ২৯ নভেম্বর দুপুর নাগাদ জ্ঞান ফিরলে জানতে পারলাম, আমার শরীর থেকে বুলেটটা বের করা হয়েছে এবং শিগগিরই সেরে উঠবো আমি। হাসপাতালে ফুলের তোড়া নিয়ে জেনারেল গিল আমাকে দুইদিন দেখতে এসেছিলেন। পয়লা ডিসেম্বরের পর থেকে তাঁকে আর দেখছিলাম না। খোঁজখবর করলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলছিল না। বোধহয় নিজেদের গোপনীয়তা ভাঙতে চায় না আর কি! কয়েকদিন পর জানতে পারলাম, ময়মনসিংহের কামালপুর সাব-সেক্টরে একটি অপারেশন পরিচালনা করতে গিয়ে মাইন বিস্ফোরণে জেনারেল গিলের পা উড়ে গেছে। প্রবীণ, সাহসী এই জেনারেলের দুর্ঘটনার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছাতক যুদ্ধের পর থেকে (১৮ অক্টোবর) তখন পর্যন্ত ৫ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর মীর শওকতের সঙ্গে আমার আর দেখা বা যোগাযোগ হয় নি। ১৪/১৫ ডিসেম্বর সিলেটের লামাকাজি ঘাটে তাঁর সঙ্গে

দেখা হয় আমার। যদিও কমান্ডার শওকতের হেড কোয়ার্টার শিলংয়েই অবস্থিত ছিল।

যুদ্ধের ভেতর পলিটিক্স

শিলং সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় উল্লেখ করার মতো একটি ঘটনা ঘটে। ১১ ডিসেম্বর এক বাংলাদেশি ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এলেন। তিনি তার পরিচয় দিলেন ব্যারিস্টার আবদুল হক বলে। সিলেট জেলার একজন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি তিনি। আবদুল হক আরো জানালেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার প্রধান রাজনৈতিক সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। আবদুল হক নামের এই ভদ্রলোককে আমি আগে কখনো দেখি নি। আর দেখার সুযোগই-বা কোথায়! ১০ অক্টোবরই তো রংপুরের রৌমারী এলাকা থেকে দীর্ঘ ভারতীয় ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে সোজাসুজি ছাতকের উত্তপ্ত রণাঙ্গনে প্রবেশ করেছি। তারপর থেকে তো একের পর এক যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে আহত হয়ে আবার ২৮ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে।

নিজের পরিচয় দেয়ার পর আবদুল হক আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, আমি আপনার অজান্তে আপনার একটা বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছি। আমি তো হতভম্ব। বলে কি লোকটা! তার সঙ্গে তো কস্মিনকালেও আমার দেখাসাক্ষাৎ কিছু হয় নি। অত্যন্ত বিনয় ও অনুশোচনার সঙ্গে আবদুল হক তারপর এক হীন চক্রান্তের কথা শোনালেন। তিনি বললেন, ছাতক যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর অক্টোবরের শেষদিকে বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার প্ররোচনা ও পিড়াপিড়িতে তিনি বাংলাদেশ ফোর্সের হেড কোয়ার্টারে লেখা এক চিঠিতে অবিলম্বে আমাকে তৃতীয় বেঙ্গল থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলেন।

ব্যারিস্টার আবদুল হকের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ করেই আমার মনে পড়ে গেলো, মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই এমনি এক চক্রান্তের মাধ্যমে নিতান্ত জুনিয়র অফিসার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামকে এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার নিযুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক মেজর জিয়াকে কিছুদিনের জন্যে হলেও গারো পাহাড়ের তেলঢালায় নির্বাসিত করা হয়। এখানেও আবার সেই একই নোংরা সামরিক রাজনীতির খেলা। আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন অপ্রত্যাশিত ছিলো না বলে মর্মাহত হলাম না। ব্যারিস্টার হক জানালেন, তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন। একতরফা কথা শুনে এরকম একটা কাজ করা তাঁর ঠিক হয় নি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে চললেন। বুঝতে পারছিলাম, তীব্র অনুশোচনায় ভুগছেন তিনি। আবদুল হক আরো বললেন, ৫ নম্বর সেক্টরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে সত্যিকারের যুদ্ধ কারা করছেন তার কাছে সেটা এখন দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। আর কারাই-বা শিলংয়ের মতো নিরাপদ জায়গায়

থসে যুদ্ধের কাগুজে বিবরণ বিডিএফ হেড কোয়ার্টারে পাঠিয়ে কৃতিত্ব জাহির করছেন সেটাও তিনি বুঝতে পেরেছেন। আবদুল হক চলে যাওয়ার আগে জানালেন, শিগ্গিরই তার এই ভুলের সংশোধন করবেন তিনি।

এ ঘটনার ক'দিন পরই বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। মুক্তির বাঁধভাঙা আনন্দে উদ্বেল ব্যারিস্টার হক ১৬ ডিসেম্বর একটি প্রাইভেট কারে ছাতক থেকে সিলেট যাচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাঁর গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বড়ো গাছে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন আবদুল হক। বিজয়ের আনন্দমুখর মুহূর্তে এই আকস্মিক বিয়োগান্ত ঘটনায় আমরা সবাই বিমূঢ়। স্বাধীনতার আস্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হলো না ব্যারিস্টার হকের জন্য। আমাকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিও পূরণ করতে পারলেন না তিনি। তবে আমি তৃতীয় বেঙ্গলেই রয়ে গেলাম।

পাকিস্তানিদের পাল্টা হামলা ও পশ্চাদপসরণ

পাল্টা আক্রমণের জন্য আমি নবীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছিলাম। পরে জেনেছি, আমরা ছোটখেল দখল করার ঠিক এক ঘন্টার মাথায় পাকিস্তানিরা হামলা চালায়। সারাদিন তারা কয়েকবার কাউন্টার অ্যাটাক করে। সেই সঙ্গে চলেছে আর্টিলারি ফায়ার। পাকসেনারা ছোটখেল থেকে পিছিয়ে গিয়ে রক্ষণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল। এরি মধ্যে তাদের নতুন সৈন্য আনা হয়; কিন্তু নবীকে তারা পজিশন থেকে সরাতে পারে নি। ২৮ নভেম্বর সারাদিন নবীকে পাকিস্তানি কাউন্টার অ্যাটাক সামলাতে হয়। ২৯ নভেম্বর ভারতীয় সাব-সেক্টর কমান্ডার কর্নেল রাজ সিং তাকে বলে, তুমি যেমন করে হোক ছোটখেল ধরে রাখো। আমরা কাল সকালে আবার রাধানগর আক্রমণ করবো। তবে ৩০ তারিখ সারাদিন কেউ কাউকে আক্রমণ করে নি। এদিকে নবীর পজিশন আর ধরে রাখা যায় না এমন একটা অবস্থা। শেষমেষ নবী সিদ্ধান্ত নিলো, সে নিজেই রাধানগর আক্রমণ করবে। আহত হওয়ার পর আমি নবীকে যে চিঠিটা লিখি তাতে বলেছিলাম, এখন থেকে ডাউকি সাব-সেক্টরে তৃতীয় বেঙ্গলের যতো সৈন্য রয়েছে সে তার কমান্ডার হবে এবং সেই অনযায়ী নবী সিদ্ধান্ত নেয়, ভারতীয়দের আশায় বসে থাকলে আর চলবে না, যা করার নিজেদেরই করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নেয় তিন কোম্পানি এফএফ এবং আলফা ও ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে সম্মিলিতভাবে রাধানগর অ্যাটাক করবে। এফএফ কোম্পানিগুলো নয় মাস ধরেই ঐ এলাকায় যুদ্ধ করছিল, একই অবস্থানে থেকে। আক্রমণের সময় নির্ধারিত হলো ৩০ নভেম্বর শেষ রাত। এফএফ আর আলফা কোম্পানি রাধানগর আক্রমণ করবে। ছোটখেল থেকে নবী তার ডেল্টা কোম্পানির ট্রুপস্ নিয়ে ফায়ার সাপোর্ট দেবে। কিন্তু অ্যাটাকের আগেই শেষ রাতে বোঝা গেলো, রাধানগর প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্স ফাঁকা। পাকিস্তানি

সৈন্যদের কোনো সাড়াশব্দ নেই সেখানে। পরে জানা যায়, নবীর অ্যাটাকের আগেই তারা পজিশন গুটিয়ে নিয়ে গোয়াইনঘাটে পিছিয়ে যায়। সারাদিন চেষ্টা করেও নবীকে সরাতে না পেরে ওরা ধরে নেয়, ছোটখেল তো উদ্ধার করা গেলোই না, রাধানগরেও শেষ পর্যন্ত থাকা যাবে না। কারণ রাধানগরে সৈন্য, রসদ এসব কিছু পাঠাতে হলে নবীর ছোটখেলের পজিশনের সামনে দিয়েই যেতে হবে। এজন্য আহতদেরকেও সরাতে পারছিল না পাকসেনারা। সর্বোপরি হেড কোয়ার্টারের সংযোগ সূত্র থেকে গোয়াইনঘাট ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল তারা।

নবীর অগ্রাভিযান

বিনা যুদ্ধে রাধানগরের দখল পেয়েও থামলো না নবী। সে তখন গোয়াইনঘাটের দিকে মুভ করলো। গোয়াইনঘাট গিয়ে নবী দেখে সেখান থেকেও ভেগে গেছে পাকবাহিনী। এরি মধ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ শুরু করে। ট্রুপস্ নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে নবী শালুটিকর এয়ারপোর্টের বিপরীতে কোম্পানিগঞ্জ গিয়ে পৌছায়। নদীর এপারে কোম্পানিগঞ্জ, ওপারে শালুটিকর। নবীর ট্রুপস্ অবস্থান নেয় এপারে। এখানে নবীর ওপর বেশ কয়েকবার অ্যাটাক হয়। কিন্তু ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও তার বাহিনীকে পিছু হটাতে পারে নি পাকবাহিনী। এরই মধ্যে নবীর সঙ্গে আসাম রেজিমেন্ট, বিএসএফ এবং গুর্খা রেজিমেন্টের একটি করে কোম্পানি যোগ দিয়েছিল। নবী এদেরকে নিয়ে গোয়াইনঘাট থেকে সামনে অগ্রসর হয়। তার নিজের ট্রুপস্ তো আছেই, তৃতীয় বেঙ্গলের দুই কোম্পানি, এফএফ তিন কোম্পানি, সেই সঙ্গে ভারতীয় তিন তিনটি কোম্পানি। নবীরা এপারে থাকলে পাকিস্তানিদের সমূহ অসুবিধা। তাই তারা নবীকে হটাতে কয়েকবার আক্রমণ চালালো ; কিন্তু এখান থেকেও নবীর ট্রুপস্‌কে এক চুল নড়াতে পারলো না পাকিস্তানিরা।

রাজ সিংয়ের মতলববাজি

এমনি সময় কর্নেল রাজ সিং আবার কর্তৃত্ব ফলাতে এলো নবীর ওপর। ২১ নভেম্বরের পর মুক্তিবাহিনী অফিসিয়ালি মিত্রবাহিনীর অধীনস্থ হয় বলে গিলের অনুপস্থিতিতে সে-ই তখন কমান্ডার। রাজ সিং নবীকে বললো, তোমার ওপর অর্ডার আছে, তুমি এখন ছাতক যাবে। সেখানে গিয়ে তৃতীয় বেঙ্গলের যে বাকি ট্রুপস্ আছে, তাদের সঙ্গে মিলিত হবে। নবীকে ছাতক পাঠিয়ে দেয়া হলো। বিশেষ উদ্দেশ্যে এটা করা হলো। ভারতীয়রা চায় নি আমাদের সৈন্যরা আগে সিলেট প্রবেশ করুক। যদিও নবী ডিসেম্বরের ৪/৫ তারিখেই তৃতীয়

বেঙ্গলের সেনাদলসহ কোম্পানিগঞ্জ অর্থাৎ সিলেটের উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল। রাজা সিংয়ের কথামতো নবী তার ট্রুপস্ নিয়ে ছাতক চলে যাওয়ার পর কোম্পানিগঞ্জে রইলো আলফা কোম্পানি। ইতিমধ্যে সৈয়দপুর এলাকার যুদ্ধে আহত ক্যাপ্টেন আনোয়ার, চিকিৎসার জন্য যাকে শিলং পাঠানো হয়েছিলো, ছাতকের যুদ্ধের পরপরই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে কোম্পানিগঞ্জে আলফা কোম্পানিতে জয়েন করলো। ইতিমধ্যে ছাতক দখল হয়ে গেছে। ঐ এলাকায় তৃতীয় বেঙ্গলের সেনাদলের কমান্ডার ছিল ক্যাপ্টেন মোহসীন। নবী ছাতকে পৌঁছে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

এরপর মোহসীনের নেতৃত্বে সম্মিলিত তৃতীয় বেঙ্গল (আলফা কোম্পানি বাদে) সিলেটের পথে অগ্রসর হয়। তৃতীয় বেঙ্গল ছাতক-গোবিন্দগঞ্জ হয়ে ১৪ ডিসেম্বর সিলেটের কাছে সুরমা নদীর লামাকাজি ঘাটে অবস্থান করতে থাকে।

দেশে ফেরা

ইতিমধ্যে আমি ১৩ ডিসেম্বর হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ্‌ড্ হয়ে জিপ নিয়ে প্রথমে এলাম রাধানগর। সেখানে কাউকে পেলাম না। আগ বেড়ে পৌঁছুলাম গোয়াইনঘাট। সেখানেও হতাশ হতে হলো। জানা গেলো, আমাদের ট্রুপস্ সেখানে ছিলো, তবে তারা আরো সামনে এগিয়ে গেছে। গোয়াইনঘাটে একটা সমস্যা দেখা দিলো। সেখানে গাড়ি পার করার কোনো উপায় নেই। সে জন্য জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে শিলংয়ের কাছে একটা রোড জংশনে পৌঁছুলাম। সেখান থেকে চেরাপুঞ্জি। চেরাপুঞ্জি পার হয়ে আমাদের প্রথম ক্যাম্প বাঁশতলায় যাই। বাঁশতলা গিয়ে নদী পার হলাম। অর্থাৎ প্রায় একশো কুড়ি মাইল ঘুরে গিয়ে নদী পার হতে হলো আমাকে। এভাবে পৌঁছুলাম ছাতকে, সেখানে গিয়ে আবার ফেরিতে করে নদী পার হতে হলো। আমার সঙ্গে তিন-চারজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। ছাতকেও কাউকে পাওয়া গেলো না। অর্থাৎ আমাদের সৈন্যরা এগিয়েই চলেছে। গোবিন্দগঞ্জ পৌঁছে শুনলাম তৃতীয় বেঙ্গল আরো সামনে চলে গেছে। শেষটায় লামাকাজি ঘাটে তাদেরকে পাওয়া গেলো। টুআইসি (2nd in Command) ক্যাপ্টেন মোহসীন, নবী, আকবরসহ অন্যরা আমাকে দেখে ভয়ানক খুশি। আমিও এতোদিন পর ওদের দেখে আনন্দিত। দিনটি ছিল একাত্তরের ১৫ ডিসেম্বর।

শেষ সন্তাত

১৬ ডিসেম্বর সকালে সুরমা নদীর লামাকাজি ঘাটে একটা ঘটনা ঘটলো। এই রণাঙ্গনে আগের দিন থেকে যুদ্ধবিরতি চলছে। নদীর ওপারে অবস্থানরত পাকসেনা ও তাদের সহযোগীরা হঠাৎ যাবতীয় অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্য সরঞ্জামাদি নদীতে ফেলে দিতে শুরু করে। কাঠের তৈরি কয়েকটা ফেরি বোটও

ডুবিয়ে দিলো তারা। অবশিষ্ট ছিল একটা মাত্র ফেরি। পাকসেনারা সেটাও বিনষ্ট করার প্রস্তুতি নেয়ায় নদীর এপার থেকে তাদেরকে এ কাজ না করার অনুরোধ জানালাম। পাকিস্তানিরা আমাদের কথায় কান দিলো না। উপায়ান্তর না দেখে কয়েক রাউন্ড ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দু'পক্ষ আবার যুদ্ধাবস্থায় ফিরে গেলো। নদীর এপারে তৃতীয় বেঙ্গল এবং তার সঙ্গে ৫ নম্বর সেক্টরের কয়েক কোম্পানি এফএফ যোদ্ধা। ওপারে পাকসেনা দল, তাদের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী ফ্রন্টিয়ার কনস্ট্যাবুলারি এবং এদেশী সহযোগী রাজাকারদের সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা বিরাট একটা বাহিনী। দু'পক্ষের মাঝখানে ব্যবধান বড়োজোর ১৫০ গজ। পাকসেনারা আমাদের গুলির পাল্টা জবাব দিলো না। তবে তারা সবাই যার যার পজিশনে চলে গেলো। টান টান উত্তেজনা ও উদ্বেগের মধ্যে কয়েক ঘন্টা কেটে গেলো। বেলা তিনটার দিকে সিলেট শহর থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটা শিখ রেজিমেন্টের কয়েকজন অফিসার ও সেনাসদস্য কয়েকটা গাড়ির একটা কনভয় নিয়ে শাদা পতাকা উড়িয়ে ঘাটে এলো। সিলেটে অবস্থানরত পাকবাহিনীর কমান্ডারের অনুরোধে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার জন্য মিত্রবাহিনীর কমান্ডার এই শিখ সেনাদলকে পাঠিয়েছেন। উল্লেখ্য, শিখ রেজিমেন্টটি সিলেটের দক্ষিণ-দিক থেকে এসে ১৫ ডিসেম্বর রাতে অন্যান্য ভারতীয় সেনা ইউনিটের সঙ্গে শহর এলাকায় ঢোকে। নদীর এপারে এসে শিখ সেনাদলের কমান্ডার মিত্রবাহিনীর এই রণাঙ্গনের সেনা-অধিনায়কের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির কঠোর নির্দেশ জানিয়ে দিলো আমাকে। আমিও দাবি করলাম, পাকসেনারা যাতে আর কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদ পানিতে না ফেলে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। ফেরি বোটটিরও কোনো ক্ষতি যেন তারা না করে। এক পর্যায়ে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হলো। মধ্যস্থতাকারী শিখ সেনাদল ফিরে গেলো। পুরোপুরি যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠিত হলো এবার।

বিজয় যাত্রা

দ্রুত নদী পার হয়ে সিলেটের দিকে যাত্রা করলাম আমরা। আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে একই রাস্তার একপাশ দিয়ে মাথা নিচু করে হেঁটে চলেছে পরাজিত পাকসেনারা। অন্য পাশে দৃপ্তপদভারে চলেছে বিজয় গর্বে উল্লসিত মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধারা। দু'দলের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। কেউ কারো প্রতি বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য বা ক্রোধও প্রকাশ করছিল না। সে এক বিচিত্র সহাবস্থান।

মোহসীন ও নবীকে সঙ্গে নিয়ে আমি জিপে করে সন্ধ্যার আগেই সার্কিট হাউসে পৌঁছে গেলাম। সার্কিট হাউসের লনে জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়াকে দাঁড়ানো দেখলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সিলেটের ডিসি সৈয়দ আহমদ এবং এডিসি শওকত আলী। দু'জনই এখন সচিব হিসেবে কর্মরত।

সিলেট যাওয়ার পথে আমরা কয়েকজন মাঝারি র‍্যাঙ্কের পাকিস্তানি অফিসারকে আহ্বান জানিয়েছিলাম আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। জবাবে তারা জানায়, ইচ্ছে থাকলেও তারা সেটা করতে পারবে না। পাকিস্তানি হাইকমান্ডের নির্দেশ আছে তারা যেন সিলেটে এসে সবাই এক সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করে, মুক্তিবাহিনীর কাছে নয়। পাকিস্তানিদের আত্মমর্যাদা বোধের এই পরিচয় পেয়ে আমরা চমৎকৃত হলাম। যে বাঙালিদের নির্মূল করার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, মুক্তিবাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে তাদের সম্মানে বাধছে।

ফেরিঘাটে পানিতে ফেলে দেয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের জন্য আমি ডেল্টা কোম্পানির সিনিয়র জেসিও সুবেদার আলী নওয়াজকে নির্দেশ দিলাম। অস্ত্র উদ্ধার শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা প্লাটুন নিয়ে ঘাটে অবস্থান করতে বললাম তাকে। প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে আলী নওয়াজ কয়েক হাজার অস্ত্র ও প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করে। পরে কয়েকটি রেল ওয়াগনে করে ঐ অস্ত্রসম্ভার ঢাকায় পাঠানো হয়। ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আমরা সার্কিট হাউসে পৌছানোর পর বিপুলসংখ্যক মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছিল। একসময় উত্তেজিত জনতা কয়েকজন রাজাকারকে মারধর শুরু করলো। মেজর জিয়া এতে একটু বিচলিত হয়ে ডিসি-কে শহরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলানোর পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'Anyone must not be punished without proper trial. There must be no retribution and no reprisals'.

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ

পরদিন, ১৭ ডিসেম্বর সিলেটে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, মিত্রবাহিনী এই অনুষ্ঠানে আমাদের কাউকে আমন্ত্রণ করে নি। অথচ জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া ও তাঁর অধীনস্থ প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক আমরা সবাই সেদিন সিলেটে ছিলাম। তবে আমার কয়েকজন অফিসার কৌতূহলী হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তা উপভোগ করে। উল্লেখ্য, ১৬ ডিসেম্বর বিকেলেই আনোয়ারের আলফা কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার ও ইকো কোম্পানি সেনাদল শালুটিকর বিমানবন্দরের বিপরীতে অবস্থিত পিয়াইন নদীর অবস্থান থেকে নদী পার হয়ে শহরে ঢুকে পড়ে। প্রায় দু'মাস পর তৃতীয় বেঙ্গলের সবগুলো কোম্পানি একত্র হয়। আমরা সাময়িকভাবে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়েছিলাম।

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ

১৭ ডিসেম্বর বিকেলে লে. নবীকে নিয়ে স্থানীয় টি অ্যান্ড টি এক্সচেঞ্জে গেলাম। উদ্দেশ্য বাবা-মা ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের খোঁজখবর নেয়া। ঢাকায় কথা বললাম। আমার এবং রাশিদার পরিবারের কারো কোনো ক্ষতি হয় নি জেনে আশ্বস্ত হলাম। নবীও তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হলো।

সিলেটের শেষ দিনগুলো

কয়েকদিন পর মেজর জিয়া তাঁর হেড কোয়ার্টার নিয়ে শ্রীমঙ্গল চলে গেলেন। প্রথম ও অষ্টম বেঙ্গল যথাক্রমে শায়েস্তাগঞ্জ ও মৌলভীবাজার এলাকায় অবস্থান নিলো। তৃতীয় বেঙ্গল নিয়ে আমি সিলেট শহরেই রয়ে গেলাম। সিলেট মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে কোম্পানিগুলো অবস্থান নিয়েছিল। ওয়াপদা রেস্ট হাউস হলো তৃতীয় বেঙ্গলের অফিসার্স মেস।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে জিয়া একদিন ফোনে আমাকে বললেন, পাকবাহিনীর বন্দিদশা থেকে তাঁর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সহধর্মিণী সিলেটে মাজার জিয়ারত করতে চেয়েছেন। আমাকে এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেগম জিয়া তাঁর দুই ছেলেসহ বেশ কয়েক মাস পাকবাহিনীর হাতে অন্তরীণ থাকার পর ১৬ ডিসেম্বর অন্য যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুক্তি পান। আমি ও আমার স্ত্রী রাশিদা বেগম জিয়াকে হযরত শাহজালালের মাজারে নিয়ে গেলাম। সেখান থেকে তিনি মাইল পনেরো দূরে রানীপিঙ নামে একটা গ্রামে যেতে চাইলেন। চট্টগ্রামে পাকসেনাদের হাতে বন্দি অবস্থায় নিহত শহীদ লে. ক. এম. আর. চৌধুরীর স্ত্রী তখন রানীপিঙে ছিলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটাবার পর বেগম জিয়া সেদিনই শ্রীমঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

কয়েকদিনের মধ্যেই সিলেট শহরে ৪ ও ৫ নম্বর সেক্টরের সেক্টর হেড কোয়ার্টার অবস্থান নিলো। তাদের অধীনস্থ মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে শহরে সমবেত হতে থাকলো। সিলেট শহরে তখন হাজার দশেক সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, তৃতীয় বেঙ্গল, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সদ্য আত্মসমর্পণকারী প্রায় এক ডিভিশন পাকসেনার মহাসমাবেশ। ভারি সামরিক যান চলাচলের শব্দে চারদিক গমগম করতে লাগলো। মনে হচ্ছিল, শহরে সাধারণ মানুষের চেয়ে অস্ত্রধারীদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতেও কোথাও কোনো রকম আইন-শৃঙ্খলা-বিরোধী ঘটনা ঘটে নি।

কয়েকদিন মেডিকেল কলেজে থাকার পর আমরা সাবেক ইপিআর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার এলাকায় অবস্থান নিলাম। জায়গাটার নাম মনে নেই। এখানে অবস্থানকালেই প্রধান সেনাপতি কর্নেল ওসমানী তৃতীয় বেঙ্গল পরিদর্শনে এলেন। কয়েকদিন পর আবার স্থান পরিবর্তন করলাম আমরা। এবার এলাম খাদিমনগরে। এখানে পাকবাহিনীর একটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট ছিল। বিশিষ্ট

মুক্তিযোদ্ধা নাজিম কোয়ায়েস চৌধুরীর সৌজন্যে আমাদের পরিবারের থাকার জন্য স্থানীয় চা বাগানে একটা বাংলো পাওয়া গেলো। ১৯৭২ সালের মে মাস পর্যন্ত তৃতীয় বেঙ্গল খাদিমনগরেই ছিল। এরপর আমরা কক্সবাজার যাই।

অনেকদিন পর ঢাকায়

খাদিমনগরে থাকার সময়ই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ পেলাম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটাই প্রথম ঢাকা সফর। পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে এলাম। অফিসার্স কোয়ার্টারে আমার নিজের বাসা দেখতে গেলাম। জিনিসপত্র কিছুই নেই বাসায়। একটা আলপিনও না। কোয়ার্টারে কয়েকজন যুদ্ধবন্দি ছিল। তারা জানালো, তারা আসার সময়ও বাসায় কিছুই ছিল না। আমার ধারণা হলো, স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এপ্রিল মাসেই আমাদের সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র মাল-এ-গনিমত হিসেবে লুট করিয়েছিল। যাই হোক, মুক্তিযুদ্ধে এদিক থেকে আমি একেবারেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। আক্ষরিক অর্থেই তখন আমি সর্বহারায় পরিণত হয়েছিলাম।

রাজাকার শিরোমণির কথা

ঢাকায় অবস্থানকালে একদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে যাই। সেখানে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল ফিরোজ সালাহউদ্দিনকে দেখলাম। তিনি আবার কর্নেল ওসমানীর খুবই প্রিয়পাত্র। শোনা যায়, এই লে. কর্নেল ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকবাহিনীর প্রধান রাজাকার রিক্রুটিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হেড কোয়ার্টারে তাকে দেখে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তীব্র ঘৃণা হলো আমার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পা-চাটা এই লে. কর্নেলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হলো না। কয়েকদিন পর সিলেট ফিরে এসে ওসমানীর টেলিফোন পেলাম। আমি কেন ঐ অফিসারটিকে স্যালুট করি নি, তার ব্যাখ্যা চাইলেন ওসমানী। তিনি আমাকে এই 'অপরাধের' জন্য কোর্ট মার্শাল করার হুমকি দিলেন। আমি অনমনীয়ভাবে বললাম, 'ঠিক আছে তাই হোক।' যে-কোনো কারণেই হোক ওসমানী তাঁর হুমকি কাজে পরিণত করতে পারেন নি।

তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠন

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তৃতীয় বেঙ্গলে একটা ভাঙনের সুর বেজে ওঠে। ১৭ তারিখেই জেড ফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া আমার কাছ থেকে লে. নবীকে তাঁর হেড কোয়ার্টারে নিতে চাইলেন। EME Corps-এর অফিসার নবী সেদিনই তাঁর হেড কোয়ার্টারে চলে গেলো। এর কয়েকদিন পর আকবরকেও ছেড়ে দিতে হলো DGFI-এ জয়েন করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের আগে আকবর

সামরিক গোয়েন্দা বিভাগে চাকরিরত ছিলো বলে ঐ সংস্থাটির পুনর্গঠনকালে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় বেঙ্গলে রয়ে গেলাম আমি, মোহসীন, আনোয়ার, মনজুর ও হোসেন। ইতিমধ্যে ফ্লাইট লে. আশরাফকেও বিদায় দিতে হলো বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য। ব্যাটালিয়নের ডাক্তার ওয়াহিদও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে তার কোর্স শেষ করার জন্য চলে গেলো।

মেডিকেল ছাত্র ওয়াহিদ নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাদের চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছিল, যা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

দ্বিতীয়বারের মতো তৃতীয় বেঙ্গলের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করতে হলো আমাকে। ইকো কোম্পানি ভেঙে দিলাম। সাবেক ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও নিজস্ব বাহিনীতে ফিরে যেতে চাইছিলো। তাদের সবাইকে ছেড়ে দিলাম। ব্যাটালিয়নের অন্যান্য ছাত্র ও গ্রামের যুবকদের মধ্যে যাদের উপযুক্ত মনে হলো, তাদের সবাইকে নিয়মিত সৈনিক হিসেবে রেখে দিলাম। পুনর্গঠনের কারণে তৃতীয় বেঙ্গলের সেনা-সদস্য সংখ্যা মাত্র ক'দিনের ব্যবধানে ১৩শ' থেকে ৭শ'-তে গিয়ে ঠেকে। এদিকে খাদিমনগরে অবস্থানকালে দ্বিতীয় মূর্তি কোর্স-এর ছ'জন অফিসার ক্যাডেট তৃতীয় বেঙ্গলে যোগ দেয়। দু'জন বাদে এদের সবাই পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পায়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর

জানুয়ারির ৮/৯ তারিখে সিলেটে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। রাতে রেডিওর খবরে ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর মুক্তি পাওয়ার খবর শুনে উল্লসিত মুক্তিযোদ্ধারা হাজার হাজার রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলির আওয়াজ শুনে শহরবাসী প্রথমটায় ভড়কে যায়। পরে আসল ব্যাপার জানতে পেরে তারাও রাস্তায় নেমে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসে যোগ দেয়।

সব সম্ভবের দেশে

বাংলাদেশ সব সম্ভবের দেশ। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেলো, রাজাকার রিক্রুটিং অফিসার সেই লে. কর্নেল সাহেব সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের পদে নিযুক্তি পেলেন। কী বিচিত্র এই বঙ্গদেশ! এরপর থেকে সেই লে. কর্নেল ভদ্রলোকের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। একসময় তিনি ব্রিগেডিয়ার হলেন। আশির দশকের শেষে হলেন রাষ্ট্রদূতও।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমেই কেমন যেন ফ্যাকাশে হতে লাগলো। যে চেতনাকে ধারণ করে একদিন সবকিছু তুচ্ছ করে একটি পদাতিক ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম, সেই চেতনা ক্রমশই ম্লান হতে লাগলো একের পর এক স্বাধীনতা-বিরোধী কর্মকাণ্ডে। যে চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে এক নিভৃত পল্লির মাটিতে রক্ত বিসর্জন দিয়েছি, রক্ত ঢেলে দিয়েছে

স্বাধীনতাকামী লক্ষ মানুষ, সেই চেতনার ছবিটা ধূসর থেকে ধূসরতর হতে লাগলো স্বাধীনতা-বিরোধী পরাজিত ঘাতকদের আস্ফালনে। এসব দেখে ক্রমে প্রচণ্ড হতাশ হয়ে পড়লাম।

জ্বলে একাত্তরের শিখা

একাত্তর থেকে সাতানব্বুই। কেটে গেছে ছাব্বিশটি বছর। এরই মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, পেয়েছি প্রিয় জাতীয় সঙ্গীত আর পতাকা। আবার এরই মধ্যে বিপন্ন হয়েছে স্বাধীনতার মূল্যবোধ। অন্ধকার গুহায় সাময়িক নিদ্রা কাটিয়ে গুটিগুটি করে বেরিয়ে এসেছে পলাতক সরীসৃপ। ভূলুণ্ঠিত হয়েছে অগণিত শহীদের আত্মত্যাগের মহিমা। বিস্মৃতিপ্রবণ বাঙালির আত্মঘাতী চরিত্র দেশকে ঠেলে নিয়ে গেছে সেই পথে। আবার একাত্তরই আমাদের দিয়েছে একটি প্রজন্ম। স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে যে শিশু, সে আজ টগবগে যুবক। এই যুবককেই দেখি স্বাধীনতা-বিরোধীদের বিচার দাবি করে মিছিলে বজ্রমুষ্টি তুলতে। তাই দেখে ভরসা পাই। গর্বে ভরে ওঠে বুক। একের পর এক প্রজন্মের প্রাণে এভাবেই ছড়িয়ে যায় একাত্তরের শিখা। সে শিখা নিভবে না কোনো দিন।

দ্বিতীয় পর্ব

রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট

সর্বনাশের বার্তা

আমি এমনিতে সকাল ছ'টার দিকেই ঘুম থেকে উঠি। সেদিনও আমার ঘুম ভাঙলো ঠিক একই সময়ে। অবশ্য স্বাভাবিকভাবে নয়, ঘুম ভাঙলো দরোজার ওপর অসহিষ্ণু করাঘাতের শব্দে। এভাবেই শুরু হলো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের ভোর। এরপর থেকে একের পর এক ঘটতে থাকলো অন্যরকম, ভয়ঙ্কর সব ঘটনা। সে রাতে যখন আমি ঘুমোতে যাই, তখন প্রায় তিনটা বেজে গিয়েছিল। এর আগে এক বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে এগারোটার দিকে যখন শুতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন হঠাৎ শুনতে পেলাম বাড়ির বাউন্ডারি ওয়ালের বাইরে থেকে প্রতিবেশী ব্রিগেডিয়ার সি.আর. দত্ত (পরে মেজর জেনারেল অব.) ডাকছেন আমাকে। দেয়ালের ওপাশে দাঁড়িয়ে তিনি। কৌতূহল নিয়ে এগিয়ে গেলাম। সি.আর. দত্ত ওপাশ থেকেই বললেন, 'শাফাত, নোয়াখালির কাছে একটা ইন্ডিয়ান হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছে। ক্রুদের সবাই মারা গেছে ঐ দুর্ঘটনায়। লাশগুলো সিএমএইচ-এ আছে। আমি যাচ্ছি ডিসপোজালের ব্যবস্থা করতে। তুমিও চলো।'

প্রসঙ্গত, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ওখানকার অসন্তোষ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভারত হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করছিল। তারই একটি হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ে সেদিন। ঘুমুতে যাওয়া হলো না আর। তড়িঘড়ি কাপড়চোপড় বদলে উভয়ে দ্রুত ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। সেখানে এক বীভৎস দৃশ্য! দুর্ঘটনায় নিহত ক্রুদের দেহ মানুষের বলে চেনা প্রায় অসম্ভব। মাংস, হাড়গোড় একাকার হয়ে বিকৃত পিণ্ডে পরিণত হয়েছে। আর তার থেকে বেরুচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ। দু'জনেরই গা গুলিয়ে উঠলো ঐ দৃশ্য দেখে। যাহোক, দ্রুত দেহাবশেষগুলো হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাসায় ফিরে আসি আমি আর ব্রিগেডিয়ার সি.আর. দত্ত। রাত তখন প্রায় দুটো। বাসায় ফিরে আবার বিছানায় যেতে অল্পক্ষণেই ক্লান্ত শরীর-মন জুড়ে নেমে এলো ঘুম।

আমার বাইরের ঘরের দরোজায় ধাক্কাধাক্কিতে ঘুম ভাঙতেই আমি ভাবলাম, কি হচ্ছে? এতো সকালে দরোজার ওপর এরকম ধাক্কাধাক্কি! দ্রুত পায়ে হেঁটে

গিয়ে দরোজা খুলে দিই। দিতেই যা দেখলাম তার জন্য তৈরি ছিল না সদ্য ঘুমভাঙা চোখ। আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মেজর রশিদ (পরে লে.ক. অব.)। সশস্ত্র। তার পাশে আরো দু'জন অফিসার। প্রথমজন মেজর হাফিজ (আমার ব্রিগেড মেজর) অন্যজন লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরী (আর্মি হেড কোয়ার্টারে কর্মরত)। তাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। মনে হলো এ দু'জনকে জবরদস্তি করে ধরে আনা হয়েছে। আমার চমক ভাঙার আগেই রশিদ উচ্চারণ করলো ভয়ঙ্কর একটি বাক্য, 'উই হ্যাভ কিল্ড্ শেখ মুজিব'। অস্বাভাবিক একটা কিছু যে ঘটেছে সেটা আগন্তুকদের দেখেই বুঝেছিলাম। তাই বলে এ কী শুনছি! আমাকে আরো হতভম্ব করে দিয়ে রশিদ বলে যেতে লাগলো, "উই হ্যাভ টেকেন ওভার দ্য কনট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ খন্দকার মোশতাক।... আপনি এই মুহূর্তে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাবেন না। কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া মানেই গৃহযুদ্ধের উস্কানি দেয়া।" রশিদের শেষ দিকের কথাগুলোতে হুঁশিয়ারির সুর ছিল।

মেজর রশিদ ছিল আমার অধীনস্থ আর্টিলারি রেজিমেন্টটির অধিনায়ক। মাসখানেক আগে সে ভারত থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফেরে। তার পোস্টিং হয় যশোরে। কয়েকদিন পরেই সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ্ মেজর রশিদের পোস্টিং পাল্টে তাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য, এ ধরনের পোস্টিং সেনাপ্রধানের একান্তই নিজস্ব দায়িত্ব।

কী সর্বনাশ ঘটে গেছে একথা ভেবে স্তম্ভিত আমি! এরি মধ্যে চোখে পড়লো একটু দূরে রাস্তায় দাঁড়ানো একটা ট্রাক আর একটা জিপ। গাড়ি দুটো বোঝাই সশস্ত্র সৈন্যে। রশিদের কথা শেষ হতে-না-হতেই পেছনে বেজে উঠলো টেলিফোন। দরোজা থেকে সরে গিয়ে রিসিভার তুললাম। ভেসে এলো সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠ, "শাফায়াত, তুমি কি জানো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কারা ফায়ার করেছে?... উনিতো আমাকে বিশ্বাস করলেন না।" বিড়বিড় করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন সেনাপ্রধান। তাঁর কণ্ঠ বিপর্যস্ত। টেলিফোনে তাঁকে একজন বিধ্বস্ত মানুষ মনে হচ্ছিল। আমি বললাম, "আমি এব্যাপারে কিছু জানি না, তবে এইমাত্র মেজর রশিদ এসে আমাকে জানালো, তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণভারও গ্রহণ করেছে।" রশিদ যে আমাকে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার বিরুদ্ধে হুমকিও দিয়েছে, সেনাপ্রধানকে তাও জানালাম। সেনাপ্রধান তখন বললেন, বঙ্গবন্ধু তাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন যে শেখ কামালকে আক্রমণকারীরা সম্ভবত মেরে ফেলেছে। তবে সেনাপ্রধানের সঙ্গে কথা শেষে তাঁর অবস্থান কি সে সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রতিরোধ-উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ বা নির্দেশ কিছুই পেলাম না।

আমার মাথায় তখন হাজার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। দ্রুত আমার ব্রিগেডের

তিনজন ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে ফোন করে তাদেরকে স্ট্যান্ড টু (অপারেশনের জন্য প্রস্তুত) হতে বললাম। বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে আমার অধীনস্থ প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। ব্যারাকে শান্তিকালীন অবস্থায় কোনো ইউনিটকে অভিযানের জন্য তৈরি করতে কমপক্ষে দু'ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন। তার আগে কিছুই করা সম্ভব নয়।

ফোন রেখে ড্রইং রুমে এসে দেখি, মেজর হাফিজ (আমার ব্রিগেড মেজর) একা। রশিদ আর তার সঙ্গের আরেকজন অফিসার এরি মধ্যে চলে গেছে। রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ি দুটোও উধাও। আমার পরনে তখন স্রেফ লুঙ্গি-গেঞ্জি। মানসিক পরিস্থিতি এমন যে ঐ অবস্থাতেই বেরুনোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। হাফিজ আমাকে থামালো, 'স্যার, আপনি ইউনিফরম্ পরে নিন।' ওর কথায় যেন সংবিৎ ফিরলো আমার। ঝটপট ইউনিফরম্ পরে তৈরি হয়ে নিলাম।

হাফিজকে সঙ্গে করে বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। সেদিন আমার বাড়ির গার্ড ছিল মেজর রশিদের ইউনিটের কয়েকজন সদস্য। কে জানে এটা নিছকই কাকতালীয় ছিল কি না! গার্ডদের পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখলাম। গাড়িটাড়ি কিছু নেই। সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে যাবো। বাসা থেকে হেড কোয়ার্টার বেশি দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতেই সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম। ঠিক করলাম, আগে যাবো ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায়। ডেপুটির কাছ থেকে কোনো নির্দেশ বা উপদেশ পাওয়া যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলাম। একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। তাঁর ওপর আমার একটা আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। ডেপুটি চিফ জিয়ার বাসভবন আমার বাসা ও ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের মাঝামাঝি। জিয়ার বাসার দিকেই পা চালালাম দ্রুত। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করার পর দরোজা খুললেন ডেপুটি চিফ স্বয়ং। অল্প আগে ঘুম থেকে ওঠা চেহারা। স্লিপিং ড্রেসের পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে। একদিকের গালে শেভিং ক্রিম লাগানো, আরেক দিক পরিষ্কার। এতো সকালে আমাকে দেখে বিস্ময় আর প্রশ্ন মেশানো দৃষ্টি তাঁর চোখে। খবরটা দিলাম তাঁকে। রশিদের আগমন আর চিফের সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথাও জানালাম। মনে হলো জিয়া একটু হতচকিত হয়ে গেলেন। তবে বিচলিত হলেন না তিনি। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "So what. President is dead? Vice-president is there. Get your troops ready. Uphold the Constitution." সেই মুহূর্তে যেন সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে। ডেপুটি চিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। আমাদের এখন একটা গাড়ি দরকার।

তিন প্রধান রওনা হলেন রেডিও স্টেশনের দিকে

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসার গেট থেকে বেরিয়েই দেখি আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে ডেপুটি চিফের জন্য জিপ আসছে। জিপটাকে থামিয়ে কমান্ডিয়ার (অধিগ্রহণ) করলাম। তারপর রওনা হলাম ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের দিকে। ওদিক থেকে একটানা কিছু গুলির আওয়াজ শুনলাম। একটু সামনে যেতেই দেখলাম একটা ট্যাঙ্ক দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের সামনের মোড়টায়। ট্যাঙ্কটার ওপর মেশিনগান নিয়ে বেশ একটা বীরের ভাব করে বসে আছে মেজর ফারুক (পরে লে. কর্নেল অব.)। একটু দূরে এমটি পার্কে আমার ব্রিগেডের এসএ্যান্ডটির (সাপ্লাই এ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট) কয়েকটি সারিবদ্ধ যান। অবস্থাদৃষ্টে নিরস্ত্র অবস্থায় অরক্ষিত হেড কোয়ার্টারে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বুঝতে পারলাম। সেজন্য পদাতিক ব্যাটালিয়ন দুটোর (প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গল) প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করার জন্য ইউনিট লাইনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই দু'টি ব্যাটালিয়ন আমার হেড কোয়ার্টার সংলগ্ন ছিল।

ইউনিট লাইনে গিয়ে শুনি, ফারুক কিছুক্ষণ আগে ট্যাঙ্কের মেশিনগান থেকে গাড়িগুলোর ওপর ফায়ার করেছে। ঐ ফায়ারিংয়ে এসএ্যান্ডটির কয়েকজন সেনাসদস্য আহত হয়। কয়েকটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটা সরু রাস্তার দু'পাশে প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলের অবস্থান। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, ব্যাটালিয়ন দুটোর মাঝখানে তিনটি ট্যাঙ্ক অবস্থান নিয়ে আছে। ব্রিগেড সদর দপ্তরের সামনেও ফারুকের ট্যাঙ্কসহ দুটো ট্যাঙ্ক দেখেছিলাম। আমার মনে হলো, ব্যাটালিয়ন দুটোকে ঘিরে রাখা হয়েছে। জানতে পারলাম, প্রয়োজনে আমার ব্রিগেড এলাকায় গোলা নিক্ষেপের জন্য মিরপুরে ফিল্ড রেজিমেন্টের আর্টিলারি গানগুলোও তৈরি রয়েছে। ট্যাঙ্কগুলোতে যে কামানের গোলা ছিল না, আমরা তখন জানতাম না। জানতে পারি আরো পরে, দুপুরে।

ফোনে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে অনুযায়ী প্রথম ও চতুর্থ বেঙ্গলের সদস্যরা অপারেশনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। প্রথম বেঙ্গলের অফিসে গেলাম ; কিন্তু সেখানে যা দেখলাম, তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আশপাশের জোয়ানদের অনেককেই দেখলাম রীতিমতো উল্লাস করছে। তারা সবাই লাগোয়া টু ফিল্ড রেজিমেন্টের সৈনিক যারা ছিল মেজর রশিদের অধীনে। তবে এই রেজিমেন্টের কর্মরত প্রায় ১৩শ' সৈনিকের মধ্যে মাত্র শ'খানেক সৈন্যকে মিথ্যা কথা বলে ভাঁওতা দিয়ে ফারুক-রশিদরা ১৫ আগস্টের এ অপকর্মটি সঙ্ঘটিত করে। ঐ রেজিমেন্টেরই কয়েকজন অফিসার দেয়াল থেকে বঙ্গবন্ধুর বাঁধানো ছবি নামিয়ে ভাঙচুর করছিল। এসব দেখে মনে পড়লো একটি প্রবাদ—Victory has many fathers, defeat is an orphan. সবকিছু দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। আমার অধীনস্থ একজন সিওকেই

(কমান্ডিং অফিসার) কেবল বিমর্ষ মনে হলো।

এরি মধ্যে জোয়ানরা আমার নির্দেশ মতো তৈরি হচ্ছিল। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে সিজিএস (চিফ অফ জেনারেল স্টাফ) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ইউনিট লাইনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথম বেঙ্গলের অফিসে এসে আমাকে বললেন, সেনাপ্রধান তাঁকে পাঠিয়েছেন সমস্ত অপারেশন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়ে। এখন থেকে ৪৬ ব্রিগেডের সব কর্মকাণ্ড সেনাপ্রধানের পক্ষে তাঁর (সিজিএস-এর) নিয়ন্ত্রণেই পরিচালিত হবে। সেনাপ্রধানের নির্দেশে সিজিএস এভাবে আমার কমান্ড অধিগ্রহণ করলেন। আমার আর নিজের থেকে কিছুই করার রইলো না। এভাবে আমার কমান্ড অধিগ্রহণ করার কারণ একটাই হতে পারে, সেনাপ্রধান আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি হয়তো এমন মনে করেছিলেন যে, আমি অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত। এসব কারণেই হয়তো বিদ্রোহ শুরু হওয়ার খবর রাত সাড়ে চারটায় জেনেও সবার সঙ্গে যোগাযোগের পর সকাল ছয়টায় আমাকে ফোন করেন তিনি। ততোক্ষণে সব শেষ। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্ট সারাদিনে টেলিফোনে সেনাপ্রধানের সঙ্গে আমার ঐ একবারই মাত্র কথা হয়।

আমার কাছে এটা খুবই দুঃখজনক মনে হয়েছে যে, সেনাপ্রধান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের অনেক আগে অভ্যুত্থানকারীদের অভিযান শুরু হওয়ার খবর পেলেও তাঁর কাছ থেকে না শুনে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর আমাকে শুনতে হলো অভ্যুত্থানকারীদের অন্যতম নেতা মেজর রশিদের কাছ থেকে। এটা আজো আমার জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।

সকাল আনুমানিক সাড়ে আটটার সময় প্রথম বেঙ্গলের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো একটা বিরাট কনভয়। গাড়ি থেকে নেমে এলেন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ, উপপ্রধান জিয়া, মেজর ডালিম ও তার অনুগামী কয়েকজন সৈনিক। ডালিম ও এই সৈনিকদের সবাই ছিল সশস্ত্র। তাদের পেছনে পেছনে নিরস্ত্র কয়েকজন জুনিয়র অফিসারও আসেন। একটু পর এয়ার চিফ এ.কে খন্দকার এবং নেভাল চিফ এম.এইচ. খানও এসে পৌঁছলেন। এরি মধ্যে বিদ্রোহ দমনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছি আমরা। আমি আশা করছিলাম, বিমানবাহিনীর সহায়তায় সেনা সদরের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনে একটি সমন্বিত আন্তঃবাহিনী অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর বিরুদ্ধে পদাতিক সেনাদল এককভাবে কখনোই আক্রমণযুদ্ধ পরিচালনা করে না। সে-ক্ষেত্রে পদাতিক সেনাদলের সহায়ক-শক্তি হিসেবে বিমান অথবা ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহায়তা প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনের কোনো যৌথ পরিকল্পনা করা হলো না, যদিও তিন বাহিনীর প্রধানই

একসঙ্গে ছিলেন। মিনিট দশেক পর সেনাপ্রধান সবাইকে নিয়ে রেডিও স্টেশনের উদ্দেশে চলে গেলেন। সেনাপ্রধান এবং তাঁর সঙ্গীরা প্রথম বেঙ্গলে মাত্র মিনিট দশেক ছিলেন। এরি মধ্যে আমি সেনাপ্রধানের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁর অনুমতিক্রমে জয়দেবপুরে অবস্থানরত একটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে লে. কর্নেল আমিন আহমেদ চৌধুরীর পোস্টিংয়ের ব্যবস্থা করলাম। অফিসারটি ঐ ব্যাটালিয়নেরই সাবেক অফিসার ছিলেন। সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে ব্যাটালিয়নটিতে কোনো সিনিয়র অফিসার না থাকায় আমি এ ব্যবস্থা নিই। কথাটা এজন্য বলছি যে, সেনাপ্রধান তাঁর কয়েকটি সাক্ষাৎকার ও রচনায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আমাকে সেদিন প্রথম বেঙ্গলের ইউনিট লাইন বা ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে দেখেন নি বা আমি তাঁর কাছ থেকে দূরত্ব রেখে চলছিলাম।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ফিরলেন ঘন্টাখানেক পর। তিনি আমার অফিসে বসে সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই সারা জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সেনাপ্রধান অন্যদের নিয়ে একটি অবৈধ ও খুনি সরকারের প্রতি বেতারে তাঁর সমর্থন ও আনুগত্য ঘোষণা করে বসেন। তাঁর এই ভূমিকার ফলে আমাদের বিদ্রোহ দমনের সকল প্রস্তুতি অকার্যকর ও অচল হয়ে পড়লো। কার্যত আমাদের আর কিছুই করার থাকলো না এবং অভ্যুত্থানকে তখনকার মতো মেনে নিতে বাধ্য হলাম। রেডিওতে সেনাপ্রধানের আনুগত্যের ঘোষণা শুনে সেনানিবাসের প্রায় সমস্ত অফিসার আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে এসে ভিড় করলো। তারা সবাই এ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল যে সমগ্র সেনাবাহিনীই এ নৃশংস ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। একজন সিনিয়র অফিসার তো তার অধীনস্থ এক নিতান্ত জুনিয়র অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ৩২ নম্বরের বাড়ির মূল্যবান সামগ্রী লুটপাটে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। কয়েকদিন পর অন্যান্য জুনিয়র অফিসারের মুখে এই লুটপাটের ঘটনা শুনি।

এরপর বঙ্গভবন থেকে আদিষ্ট হয়ে খালেদ মোশাররফ দিনভর বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সংস্থা, ইউনিট ও সাব-ইউনিটের প্রতি একের পর এক নির্দেশ জারি করছিলেন। তখনকার মতো সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল বিদ্রোহের সাফল্যকে সংহত ও অবৈধ মোশতাক সরকারের অবস্থানকে নিরঙ্কুশ করা। অভ্যুত্থানকারীদের পক্ষে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলো সম্পাদন করা হয়েছিল সেদিন। ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে সেনাসদরের কোনো ভূমিকা ছিল না বলাটাই সঙ্গত হবে। প্রকৃতপক্ষে সেনাসদরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিসার আমার হেড কোয়ার্টারে অবস্থান করে সিজিএস-কে সাহায্য-সহযোগিতা করছিলেন।

সামরিক শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত

১৫ আগস্ট খালেদ মোশাররফ সেনাপ্রধানের নির্দেশে বঙ্গভবন, রেডিও স্টেশন, টিভিকেন্দ্র, বিমানবন্দর, বিদ্যুৎকেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, তিতাস গ্যাসের ট্রান্সমিশন সেন্টার ইত্যাদি নাজুক এলাকাগুলোতে আমার অধীনস্থ ৪৬ ব্রিগেড থেকে সৈন্য মোতায়েন করেন। দুপুর বারোটার দিকে বঙ্গভবন থেকে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ্ ফোন করলেন সিজিএস খালেদ মোশাররফকে। সেনাপ্রধান বললেন, অভ্যুত্থানকারীদের ট্যাঙ্কগুলোতে গান অ্যামুনিশন নেই। তিনি অ্যামুনিশন ইস্যুর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন সিজিএস-কে। খালেদ মোশাররফ তাঁর নির্দেশমতো রাজেন্দ্রপুর অর্ডন্যান্স ডিপোকে অ্যামুনিশন ইস্যুর অর্ডার দিলেন। অভ্যুত্থানকারীদের ট্যাঙ্কগুলোতে যে গান অ্যামুনিশন ছিল না, এই প্রথম সেটা জানতে পারলাম আমরা।

ক্যান্টনমেন্টে তখন বিশৃঙ্খল পরিবেশ। দুটি রেজিমেন্ট চেইন অফ কমান্ডের সম্পূর্ণ বাইরে। রশিদ-ফারুকের সঙ্গে হাত মেলানোর যেন একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ক্যান্টনমেন্টে সে সময় ৪৬ ব্রিগেড ছাড়াও ছিল লগ এরিয়া, আর্টিলারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সিগন্যাল কমান্ডের বিভিন্ন ইউনিট ও সাব-ইউনিট। আমি এদের সিও এবং ওসিদের ডেকে বললাম, "সামরিক আইনমাফিক আপনারা অবশ্যই চেইন অফ কমান্ডের অধীনে থাকবেন। এর বাইরের কোনো নির্দেশ আপনারা মানবেন না।" তারা সবাই আমার উপদেশের প্রতি সম্মতি জানালেন। এভাবে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কমান্ড ও শৃঙ্খলা ধরে রাখার চেষ্টা করি আমি। তা না হলে এদের অনেকেই হয়তো বিদ্রোহীদের প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য স্বীকার করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতেন।

দুপুরে খবর পেলাম, কুমিল্লা থেকে অনেক সৈন্য কোনো নির্দেশ ছাড়াই সিভিল বাস ও ট্রাকে করে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে ঢাকায় আসছে। কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী (পরে মেজর জেনারেল অব.)। তিনি র‍্যাঙ্কের দিক থেকে আমার সমকক্ষ, কিন্তু বয়স ও চাকরিতে অনেক সিনিয়র। তাঁকে আমি অনুরোধ করলাম সৈন্যদের ঢাকায় আসতে না দিতে। আরো বললাম, আর্মি হেড কোয়ার্টার ছাড়া কারো নির্দেশ না মানতে। যে করে হোক চেইন অফ কমান্ড রক্ষা করার অনুরোধ জানালাম তাঁকে। কর্নেল আমজাদ আমার সঙ্গে একমত হয়ে সে মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানালেন। অনেক সৈন্য অবশ্য ততোক্ষণে ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছিল। অনেকে ছিল পথে।

দুপুরের খাবার খেতে বিকেল চারটায় বাসায় ফিরলাম। মিনিট পনেরো বাসায় ছিলাম এসময়। এরি মধ্যে আকস্মিকভাবে হাজির হলেন ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থানরত আরেকটি হেড কোয়ার্টারের কমান্ডার। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর

অধীনে দু'টি রেজিমেন্ট ছিল। র‍্যাঙ্কে আমার সমপর্যায়ের হলেও চাকরি জীবনে আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন তিনি। শফিউল্লাহ্-জিয়ার সমসাময়িক। সম্পর্কে তিনি ছিলেন আমার আত্মীয়। আমাকে অবাক করে দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন, 'I surrender my command to you. please tell me about my next orders.' আমি তো হতভম্ব! এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া দূরে থাক, শুনিও নি কখনো। বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ড ঘটার দশ ঘণ্টা পরও ভয় ও উত্তেজনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অফিসারটিকে। ১৫ আগস্ট সকাল থেকে পরবর্তী সপ্তাহ্ খানেক প্রায় সব সিনিয়র অফিসারের মানসিক অবস্থাই ছিল এরকম। সামরিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নিরাপত্তাহীনতা গ্রাস করে ফেলেছিল অধিকাংশ অফিসারকে। সেদিন সেনানিবাসের অবস্থা কেমন ছিল, তার ধারণা দেয়ার জন্যই এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম। কাউকে হেয় করা আমার লক্ষ্য নয়।

সন্ধ্যার দিকে মেজর ফারুক বঙ্গভবনের একটি শাদা রঙের মার্সিডিস চালিয়ে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে এলো। চোখে-মুখে বেশ একটা উদ্ধত ভাব। আমি বারান্দায় পায়চারি করছি। অপেক্ষমাণ অফিসাররা ঘিরে ধরলো ফারুককে। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে চাইলো তারা। ফারুক বোধহয় আমাকে শোনানোর জন্যই একটু উঁচু গলায় বললো, "আমাদের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে। কেউ যদি হঠকারী কোনো উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করে, তাহলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আমাদের সহযোগিতা প্রদান করা হবে।" উল্লেখ্য, কোলকাতায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়াম ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের হেড কোয়ার্টার। ফারুক আরো জানালো, বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মনে হলো, মেজর ফারুক সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে হতোদ্যম করার জন্যই এই Psychological warfare-এর আশ্রয় নিয়েছে।

সারাটা দিন একটা উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটলো। রাতে ঘোষিত কেবিনেটের সদস্যদের নাম শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যে অবৈধ মোশতাক সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছেন, সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। জাতির স্থপতিকে হত্যা করে অভ্যুত্থানকারী সেনাসদস্যদের ক্ষমতা দখল করার কয়েক ঘণ্টা পরই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এহেন বিশ্বাসঘাতকতায় চরমভাবে হতাশ হলাম।

সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৫ আগস্ট সারাদিন আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার আর প্রথম বেঙ্গলের ইউনিট লাইনে কাটান। রাতেও সেখানেই রয়ে যান তিনি। নিরাপত্তার জন্য আমরা দু'জনই প্রথম বেঙ্গলের সেনাদের সঙ্গে রাত্রিযাপন করি। সিজিএস-কে এসময় খুব চিন্তাক্লিষ্ট

দেখাচ্ছিল। তিনি বারবার বলছিলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের যে অংশটি ক্ষমতা দখল করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য স্থাপন করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি বললেন, এই বেঈমানগুলোকে যতো শিগগির উৎখাত করা যাবে জাতির ততোই মঙ্গল। সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে হত্যাকারী ও তাদের মদদদাতা রাজনীতিকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ পরিচালনার পরিবেশ সৃষ্টি করা এখন আশু কর্তব্য। খালেদ মোশাররফ আরো বললেন, পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ঘোলাটে। পক্ষ-বিপক্ষ বোঝা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এই মুহূর্তে কোনো ভুল পদক্ষেপ নেয়া আত্মঘাতী পদক্ষেপের শামিল হবে বলে মত দিলেন তিনি। তাঁর কথায় যুক্তি ছিল বলে আমিও একমত হলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট সকালে সিজিএস সেনাসদরে চলে গেলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব দায়িত্ব পালন শুরু করলেন। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আবার আমার কাছে ফিরে এলো।

অবৈধ খুনি সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ

১৬ আগস্ট বিকেলের দিকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদের ধানমন্ডির বাসায় গেলাম। তাঁকে আমি একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী নেতা বলে জানতাম। মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়েছিল। তো, ভাবলাম তাঁর কাছে যাই। গিয়ে বলি, আওয়ামী লীগের নেতারা এটা কি করলেন! তোফায়েল আমাকে দেখে অবাক হলেন খুবই। অবাক হওয়ারই কথা। কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তিনি। আমাকেও যেন একটু অবিশ্বাস করছেন মনে হলো। আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, তিনি ইচ্ছে করলে আমার বাসায় এসে থাকতে পারেন। তোফায়েল সবিনয়ে বললেন, তেমন প্রয়োজন মনে করলে আমার বাসায় যাবেন তিনি, তবে এখন নয়। ঘন্টাখানেক তাঁর বাসায় ছিলাম। পরে শুনেছি, আমি যে তোফায়েল আহমেদের বাসায় গিয়েছি একথা প্রকাশ পাওয়ায় রাতে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, লেফটেন্যান্ট মাজেদসহ অন্যরা তোফায়েল আহমেদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে জানতে চায় আমার সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছে। সেরকম কোনো কথা হয় নি— একথা বারবার বলার পরও ডালিম এবং তার সহযোগীরা তাঁর ওপর অব্যাহত নির্যাতন চালায়। তোফায়েল আহমেদের ওপর অত্যাচারের এই খবর পেলাম রাতে। খুব অনুতাপ হচ্ছিল। আমি তাঁর বাসায় না গেলে হয়তো এই নির্যাতনের শিকার হতে হতো না তাঁকে।

মোশতাকের সহযোগী হত্যাকারীরা তোফায়েল আহমেদের আনুগত্য ও সমর্থন আদায়ের জন্য তার ওপর প্রবল মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তারা

তোফায়েল আহমেদের এপিএস শফিকুল আলম মিন্টুকেও ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায় তাঁর ওপর। এক পর্যায়ে ঐ কর্তব্যপরায়ণ তরুণ অফিসারটিকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

শোনা যায়, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মাজেদ এই নির্মম কাজটি করে। হত্যাকারী ঐ অফিসারটি এখনো সরকারি চাকরিতে (বেসামরিক পদে) বহাল রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, সরকারি কর্মচারীদের অসংখ্য সংগঠন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই অফিসারটির বিচারের ব্যাপারে কেউই সোচ্চার হন নি।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী কয়েকদিনে বিদ্রোহীরা ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও বেতার কেন্দ্রে স্থাপিত নিজেদের ক্যাম্পগুলোতে ধরে নিয়ে গিয়ে নিগৃহীত করে। বিদ্রোহীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের আনুগত্য ও সমর্থন আদায় করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রচেষ্টাও ছিল। লাঞ্ছিত ও শারীরিকভাবে নিগৃহীত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও আইনজ্ঞ আমিনুল হক। পরবর্তীকালে তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমিনুল হক পাক যুদ্ধবন্দি ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের যুদ্ধাপরাধ তদন্ত কমিশনের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্তের দায়িত্ব পালনকালে তিনি অভ্যুত্থানকারীদের দেশি-বিদেশি প্রভুদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এরই পরিণতিতে বিদ্রোহীদের হাতে তাঁকে নিগৃহীত হতে হয়। ডালিম, নূর, শাহরিয়ার ও মাজেদ—এরা তাঁর ওপর বর্বর নির্যাতন চালায়।

১৬ ও ১৭ আগস্ট ক্যান্টনমেন্টের পরিবেশ কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। সবাই যার যার অফিসিয়াল কাজকর্ম করেছি। অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতা দেখা গেলো না কোথাও। বেতারে মোশতাক সরকারের প্রতি সেনাপ্রধান ও অন্যান্য বাহিনীপ্রধানের আনুগত্য ঘোষণার পর এই দুটো দিন মূলত সেনাপ্রধানের তত্ত্বাবধানে অভ্যুত্থান-পরবর্তী পরিস্থিতি সংহত করার কাজেই ব্যাপৃত ছিলাম আমরা। চেইন অফ কমান্ড মানার স্বার্থেই এটা করতে হয়েছে আমাদের। তবে অনেককেই অতি উৎসাহে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে দেখা গেছে।

১৮ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত এক মিটিংয়ে ডিজিএফআই-এর দায়িত্বপালনরত ব্রিগেডিয়ার রউফ তোফায়েল আহমেদের বাসায় আমার যাওয়ার কথা সবাইকে অবহিত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, তোফায়েল সাহেবের বাসার সামনে আমার গাড়ি দেখা গেছে। এ কথা শুনে সেনাপ্রধান ও উপপ্রধান উভয়েই আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি যেন ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আর সম্পর্ক না রাখি, সে জন্য তাঁরা সাবধান করে দিলেন আমাকে। এই মিটিংয়ে চেইন অফ কমান্ড এবং পরবর্তী আর কোনো রক্তপাত ও সঙ্ঘাত এড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়।

১৯ আগস্ট সেনাসদরে আরেকটি মিটিং হয়। বেশ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো মিটিংয়ে। সেনাপ্রধান সভায় ঢাকাস্থ সকল সিনিয়র অফিসারকে তলব করেন। তিনি মেজর রশিদ ও ফারুককে সঙ্গে করে কনফারেন্স রুমে এলেন। বললেন, প্রেসিডেন্ট মোশতাকের নির্দেশে রশিদ ও ফারুক সিনিয়র অফিসারদের কাছে অভ্যুত্থানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে। রশিদ তার বক্তব্য শুরু করলো। সে বললো, সেনাবাহিনীর সব সিনিয়র অফিসার এই অভ্যুত্থানের কথা আগে থেকেই জানতেন। এমন কি ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারও (অর্থাৎ আমি) এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। রশিদ আরো দাবি করলো, প্রত্যেকের সঙ্গে আগেই তাদের আলাদাভাবে সমঝোতা হয়েছে। উপস্থিত অফিসারদের কেউই এই সর্বৈব মিথ্যার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না কেউ। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। নীরব থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ফারুক-রশিদের মিথ্যে বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে আমি সেদিন বলেছিলাম, "You are all liars, mutineers and deserters. You are all murderers. Tell your Mustaque that he is an usurper and conspirator. He is not my President. In my first opportunity I shall dislodge him and you all will be tried for your crimes." আমার কথা শুনে তারা বাক্যহীন হয়ে পড়ে এবং বিষণ্ণ মুখে বসে থাকে।

পরবর্তী সময়ে জীবন বাজি রেখে সে কথা রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি আমি।

যাই হোক, আমার তীব্র প্রতিবাদের মুখে মিটিং শুরু হতে-না-হতেই ভেঙে গেলো। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ উঠে গিয়ে তাঁর কক্ষে ঢুকলেন। উপপ্রধান জিয়া অনুসরণ করলেন তাঁকে। আমি তখন স্বভাবতই বেশ উত্তেজিত। তাঁদের দু'জনের প্রায় পেছনে পেছনেই গেলাম আমি। সেনাপ্রধানের কক্ষে ঢুকতেই জিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "শাফায়াত, একেবারে ঠিক আচরণ করেছো ওদের সঙ্গে। একদম সঠিক কাজটা করেছো। কিপ ইট আপ। ওয়েল ডান!" উৎসাহিত হয়ে আমি তাঁদের দু'জনকে উদ্দেশ করে বললাম, "Sir, the way I treated the murderers you must talk to Mustaque in the same language and get the conspirator out of Bangabhaban."

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেনাপ্রধান বা উপপ্রধান কেউই অবৈধ খুনি সরকারের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্টকে সরানোর মতো সৎ সাহস অর্জন করতে পারেন নি। এই বিশাল ব্যর্থতা তাঁদের উভয়ের ওপরই বর্তায়।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলতে হয়, ১৫ আগস্ট থেকে মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ যতোদিন সেনাপ্রধান ছিলেন (অর্থাৎ ২৪ আগস্ট পর্যন্ত) তাঁকে এবং মেজর জেনারেল জিয়াকে প্রায় সর্বক্ষণ একসঙ্গে দেখা গেছে। একজন যেন আরেকজনের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে ছিলেন।

১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল?

আজো একটি প্রশ্ন বহু লোকের মনকে আলোড়িত করে, অনেকে আমাকেও জিগ্যেস করেন, ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল? তৎকালীন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একাধিক কারণের উল্লেখ করবো না আমি। সে দায়িত্ব রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং ইতিহাসবিদদের। নিজের যে পরিমণ্ডলে আমার অবস্থান ছিলো, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো আমার বক্তব্য।

আমি পেছন ফিরে দেখি, সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে একটা রেষারেষি ছিল। কিছুসংখ্যক অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার, যারা মূলত যুদ্ধ শেষে পাকিস্তান প্রত্যাগত, তারা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের সহ্যই করতে পারতেন না। কয়েকজন সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করতে শুরু করেন। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতায় তারা রাষ্ট্রীয় ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাদের ষড়যন্ত্রের প্রধান লক্ষ্যই ছিল চরিত্র হননের মাধ্যমে সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের স্বপদ থেকে সরিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করা। আমার মতো একজন মাঝারি র‍্যাঙ্কের অফিসারও তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে রেহাই পায় নি। চক্রান্তকারীরা সুকৌশলে রাষ্ট্রপ্রধানকে পর্যন্ত জড়িত করতে দ্বিধা বোধ করে নি। এরকম দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করলে পাঠকবৃন্দ বুঝতে পারবেন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। প্রথমবার আমাকে চিহ্নিত করা হয় গোপন সশস্ত্র সর্বহারা পার্টির সমর্থক হিসেবে এবং দ্বিতীয়বারে সুতা চোরাচালানির পৃষ্ঠপোষকরূপে। কিন্তু কোনো অভিযোগেই আমাকে তারা ফাঁসাতে পারে নি।

পঁচাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাস। আমি ব্রিগেড নিয়ে সাভার এলাকায় ট্রেনিংয়ে ব্যস্ত। আকস্মিকভাবে একদিন বঙ্গবন্ধু আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাসভবনে। ৩২ নম্বরের তিন তলায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে কোনো ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। আমি নিজেই ইনভেস্টিগেট করবো বলে তোমার চিফ বা ডেপুটি চিফ কাউকেই বিষয়টা জানাই নি। তার প্রয়োজনও নেই। তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই আমি নিজে এর ভার নিয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে।" হতবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, "স্যার, অভিযোগটা কি?" জবাবে বঙ্গবন্ধু জানালেন, একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁকে বলেছেন, সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে নাকি তার সঙ্গে আমার গোপন বৈঠক হয়েছে। অভিযোগটি একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল

বলে আমি জোর গলায় কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তা অস্বীকার করি। বলতে দ্বিধা নেই, সিরাজ সিকদারের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় বা দেখাও হয় নি। শুধু নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন আমার কাছে। বঙ্গবন্ধু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। আমার স্পষ্ট জবাব শোনার পর তিনি বললেন, 'Go back to your duties, you need not talk about this episode to anyone. The chapter is closed and sealed'. এবার আমার পালা। আমার বারবার অনুরোধের পর বঙ্গবন্ধু সাবেক প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকীর নাম বললেন, যিনি এই মিথ্যে তথ্য তাঁকে দিয়েছিলেন। আমার জানা ছিল, সেই বিচারপতি সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তখন পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে (এসবি) কর্মরত ছিলেন, খুব সম্ভব ঐ সংস্থাটির প্রধান হিসেবে।

বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, এসবি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ও ডিজিএফআই (ডাইরেক্টরেট জেনারেল ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) উভয়ে মিলেই এটা করেছে। হিসেবও খুব সহজেই মিলে গেলো। ডিজিএফআই প্রধান ছিলেন ব্রিগেডিয়ার রউফ। তারই পৌরোহিত্যে ঐ সংস্থাটির অমুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা এসবি প্রধানের সর্বাত্মক সহযোগিতায় এরকম একটা নির্জলা মিথ্যে রিপোর্ট তৈরি করেন। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তারা একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ঐ রিপোর্ট বঙ্গবন্ধুর গোচরে আনেন। কী ঘৃণ্য হিংসাত্মক মানসিকতা!

ব্রিগেডিয়ার রউফ ও তার সহযোগীরা ঐ কাল্পনিক অভিযোগের জাল ফাঁদতে শুরু করেন সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পরদিন থেকেই। সেদিন খুব ভোরে ডিজিএফআই-এর দু'জন অমুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) দৌলা ও আমার সতীর্থ মেজর (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) মাহমুদ-উল হাসান আকস্মিকভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে অফিসে আসেন। আলাপচারিতায় তারা মূলত সিরাজ সিকদারের মৃত্যুতে আমার 'ব্যক্তিগত' প্রতিক্রিয়া জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই আমি। বিষয়টি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং তার সহযোগী অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করেছেন এমন বাঙালি অফিসারদের স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে, বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগে নিয়োগ সংক্রান্ত। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কেবল সেই ধরনের বাঙালি অফিসারদের গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হতো, যারা কি না নিষ্ঠার সঙ্গে স্বজাতি (অর্থাৎ বাঙালি) সেনা কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা নানা ধরনের রিপোর্ট দিতে উৎসাহ বোধ করবে। তাই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে মনেপ্রাণে ভিন্নমত পোষণকারী অফিসাররাই বিভিন্ন গোয়েন্দা পদে নিযুক্তি লাভ করতেন।

পাকিস্তানি প্রভুদের তুষ্ট করতে তারা অনেক নিচে নামতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, রাজনৈতিক নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে পাক গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের আত্তীকরণ, বিশেষত গোয়েন্দা সংস্থায় তাদের নিয়োগদান কতোটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছিল? ঐসব গোয়েন্দা কর্মকর্তা কতোটুকু আনুগত্য সহকারে নতুন নিয়োগদাতা বাংলাদেশ সরকারের অনুকূলে কাজ করেছিলেন, সেটা ছিলো প্রশ্নসাপেক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। গোলটেবিল বৈঠক করে তো আর বাংলাদেশ স্বাধীন হয় নি!

দ্বিতীয় ঘটনাটি পঁচাত্তর সালেরই মে মাসের। তারিখটা মনে নেই। রাত তখন এগারোটা। ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল জিয়া ফোন করে আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বললেন। আমাকে দেখা মাত্রই জিয়া বললেন, গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু তাঁকে জানিয়েছেন যে আমার অধীনস্থ একটি ইউনিটের স্টোর রুমে চোরাই সুতা পাচারের জন্য মজুদ রাখা হয়েছে। আর সেই সুতা ভর্তি স্টোর রুম থেকে ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন পর্যন্ত পুরো রাস্তা ঐ ইউনিটের সৈনিকেরা পাহারা দিচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ডেপুটি চিফকে অনুসন্ধান-সাপেক্ষে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এটা একটা অতি গুরুতর অভিযোগ। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। আমি ব্রিগেডিয়ার রউফের সঙ্গে Confrontation-এর সিদ্ধান্ত নিলাম। অনেক বাকবিতণ্ডার পর ঠিক হলো, আমার দু'জন কমান্ডিং অফিসার আর ব্রিগেডিয়ার রউফের পক্ষে তার অধীনস্থ মেজর মাহমুদ-উল হাসান (এখন মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) একসঙ্গে স্টোর রুমটি পরিদর্শনে যাবে। পরিদর্শন শেষে আমার দুই অফিসার লে. কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার অব.) আমিনুল হক ও লে. কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) হারুন আহমেদ চৌধুরী ডেপুটি চিফের বাড়িতে এসে রিপোর্ট করলেন, কথিত সেই স্টোর রুমে একগাছি সুতাও পাওয়া যায় নি। স্টোর রুমটি শুধু Firing Target-এ ঠাসা। আর রাস্তার প্রহরা সম্পর্কে তারা জানালেন, কোম্পানিগুলো Night Training-এ ব্যস্ত, তারা রাস্তা জুড়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। সঙ্গত কারণেই মেজর মাহমুদ-উল হাসান আর ডেপুটি চিফের বাসায় ফিরে আসেন নি। আর ব্রিগেডিয়ার রউফ তো অনেক আগেই ব্যস্ততা দেখিয়ে সরে পড়েছেন।

ব্রিগেডিয়ার রউফ ও তার সহযোগীদের মিথ্যাচারের কোনো সীমাপরিসীমা ছিল না। "To make mountain out of a mole hill" প্রবাদটিকেও হার মানিয়েছিল তারা। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের অনেকেরই ছিল প্রবল বৈরী মনোভাব। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বহুদিনের লালিত হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণার চরম প্রকাশ তারা ঘটিয়েছিলেন পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অন্ধ বিদ্বেষের কারণে জিয়া

হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে কতিপয় অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসার এরশাদের নেতৃত্বে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ফাঁসি, জেল ও চাকরিচ্যুত করেই এরশাদ ও তার পোষ্য ঐ অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। প্রেসিডেন্ট থাকাকালে এরশাদ এক অলিখিত নির্দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয়দের সেনাবাহিনীর অফিসার কোরে যোগদান নিষিদ্ধ করেছিলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধার মতো কর্নেল (অব.) শওকত আলী এমপির এবং আমার ছেলেও সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে একাত্তরে পরাজিত পাকবাহিনীর দোসরদের সন্তানদের জন্য সেনাবাহিনীর দুয়ার অবারিত করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এরশাদ বাংলাদেশে আগমনের পর আর্মি হেড কোয়ার্টার-এর প্রথম কনফারেন্সে মুক্তিযোদ্ধাদের দুই বছরের সিনিয়রিটিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

সিনিয়র অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে ক্রমশ সামরিক বাহিনীর চাকরিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে থাকি আমি। এমনি পরিস্থিতিতে পঁচাত্তরের জুলাই মাসের কোনো একদিন সেনাপ্রধান টেলিফোনে আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি জানালেন, বঙ্গবন্ধু আমাকে তাঁর এমএসপি করতে চান। সেনাপ্রধান আমাকে বঙ্গবন্ধুর কথায় রাজি হয়ে যেতে বললেন। সে রাতেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। বঙ্গবন্ধু আমাকে এম.এস.পি-র দায়িত্ব নিতে হবে বলে আশ্বাস দিলেন, অনতিবিলম্বে তিনি আমাকে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দেবেন। বঙ্গবন্ধু আরো জানালেন, এমএসপি-র র‍্যাঙ্ককে ইতিমধ্যেই উন্নীত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বোধহয় আবেগের বশেই ঐ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে। কারণ কর্নেল র‍্যাঙ্কের একজন অফিসারকে রাতারাতি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দেয়াটা বিধিবহির্ভূত। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বঙ্গবন্ধু হয়তো সামরিক নিয়মকানুন সম্পর্কে ততোটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমাকে ঘিরে অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের অব্যাহত চক্রান্তের কথা স্মরণ করে আমি এই স্পর্শকাতর পদে যোগদান করতে অত্যন্ত বিনীতভাবে অপারগতা প্রকাশ করি। মনে হলো বঙ্গবন্ধু এতে করে একটু মনোক্ষুণ্ন হলেন। তোফায়েল আহমেদ তখন রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক সচিব। তিনিও আমাকে ঐ পদে যোগদানের অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমার সিদ্ধান্তেই অটল থাকলাম। এছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

তিরস্কারের বদলে পুরস্কারের পরিণতি

অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র কিছু অফিসার সরকার ও সেনাবাহিনী দু'জায়গাতেই একটা পরিবর্তন চাচ্ছিলেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন উস্কানিমূলক

কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড অসন্তুষ্ট ও বিভ্রান্ত জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের প্ররোচিত করতো। সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতা আর দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ মানুষের মতো সেনাবাহিনীতেও কিছুটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তবে সেনাবাহিনীর নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে জঘন্য একটি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের জন্য এগুলো কোনো অজুহাত হতে পারে না। সেনাসদস্যদের মধ্যে এরকম একটি প্ররোচনার ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'৭৪ সালের শেষ দিকের কথা। মেজর ডালিমের সঙ্গে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তফার একটি পারিবারিক দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে ঘটনার পরদিন তদানীন্তন কর্নেল এরশাদ ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতলব আঁটেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি একদল তরুণ অফিসারকে নেতৃত্ব দিয়ে তৎকালীন সেনা উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়ার অফিসে যান এবং ঐ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের দাবি করেন। অথচ কর্নেল এরশাদ তখন এজি (অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল), অর্থাৎ সেনাবাহিনীর সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি এ ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

সেনা উপপ্রধান তাৎক্ষণিকভাবে কর্নেল এরশাদের ঐ অযৌক্তিক দাবি প্রত্যাখ্যান করে তাঁর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। বিদ্রোহতুল্য এই আচরণের জন্য জিয়া কর্নেল এরশাদকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে বলেন, তার এই অপরাধ কোর্ট মার্শাল হওয়ার যোগ্য। এ ঘটনার জন্য ঐদিনই বিকেলে বঙ্গবন্ধু তাঁর অফিসে সেনাপ্রধান, উপপ্রধান, কর্নেল এরশাদ এবং আমাকে তলব করেন। এরশাদের আচরণের জন্য উপস্থিত সবাইকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন তিনি। এরপরও সাবেক সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ কর্নেল এরশাদের বিরুদ্ধে কোনো শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তো করলেনই না, বরং তাঁর প্রিয়ভাজন এই কর্নেলকে কয়েকদিন পরই দিল্লিতে পাঠিয়ে দিলেন উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য। অল্প কয়েকদিন পরই নিয়ম-বহির্ভূতভাবে Supernumery Establishment-এ থাকা অবস্থায় তার পদোন্নতিরও ব্যবস্থা করেন। কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার হয়ে গেলেন এরশাদ।

আমার ধারণা, এরশাদ ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) আশীর্বাদপুষ্টদের অন্যতম প্রধান। ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে তিনি অন্তত চারবার বিমানযোগে বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী (?) পাকিস্তান থেকে রংপুরে তার বাড়িতে পাঠান। আটকে-পড়া বাঙালি সামরিক অফিসাররা তখন তো বিভিন্ন বন্দিশিবিরে নানারকম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। তখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে কোনো নিয়মিত বিমান চলাচলও ছিল না। অনিয়মিতভাবে চলাচলকারী আইসিআরসি (আন্তর্জাতিক রেডক্রস)-এর ভাড়া করা প্লেনে এরশাদ সাহেবের সেসব জিনিসপত্র পাচার করার অপারেশন চালানো হয়। পাক বন্দিশিবিরের

তথাকথিত বন্দি এরশাদের পক্ষে ISI-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া এধরনের কাজ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। আমার জানা মতে, আটকে-পড়া প্রায় বারোশ' অফিসারের আর কারোরই তার মতো সুযোগ পাওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। এরশাদের ওইসব অপারেশনে তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ পুরো সহযোগিতা করেছেন। শফিউল্লাহ সাহেব তাঁর এডিসির মাধ্যমে হেলিকপ্টারে করে সেই সব মালামাল রংপুর পাঠাতেন এবং আমাকে সেগুলো বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে হতো। আমি তখন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার।

এরশাদ সম্পর্কে বলার আরো রয়েছে। অভিযোগ শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি একাধিকবার বাংলাদেশে আসেন এবং যুদ্ধে যোগ দেয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে ফিরে যান। এ কারণে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারদের সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেন, সে অনুযায়ী তার চাকুরিচ্যুতি হওয়ার কথা। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যারা বাংলাদেশে এসে যুদ্ধে যোগদানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে ফিরে গেছেন, তাদেরকে এই নীতিমালা অনুযায়ী চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অন্য পঞ্চাশেক অফিসারকে এ কারণে চাকুরি হারাতে হয়। কিন্তু একই অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার পরও এরশাদ চাকুরিচ্যুত তো হনই নি, বরং প্রমোশনসহ এজি (অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল) পদে অধিষ্ঠিত হন। এর পেছনে তৎকালীন সেনাপ্রধান ও আওয়ামী যুবলীগের একজন প্রভাবশালী নেতার বিশেষ ভূমিকা ছিল। একই বিষয়ে এ দুইমুখো নীতিতে সেনাবাহিনীর অফিসাররা খুবই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তখন।

অমুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসারদের অনেকেই নিরন্তর চক্রান্ত ও মিথ্যাচারে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসাররাও তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তারা তাদের স্বগোত্রীয় (অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা) জুনিয়র অফিসারদের কৃত অনেক বিশৃঙ্খলার ঘটনা অনেক সময়ই আড়াল করে রেখেছেন, যার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা উৎসাহিত হয়েছে। এরকমই একটি ঘটনার কথা এখানে বলছি।

চুয়াত্তর সালের মধ্য এপ্রিলে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হই আমি। তার আগে আমি রংপুর ব্রিগেডের দায়িত্ব পালন করছিলাম। ঢাকায় আসার কিছুদিন পরই অন্য অফিসারদের মুখে শুনি, মেজর ফারুক এর আগে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের শেষদিকে একটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তার সমর্থনে কুমিল্লা থেকে সৈন্য দল ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিন্তু সেই সেনাদল শেষ পর্যন্ত ঢাকায় না আসায় ফারুকের অভ্যুত্থান পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ট্যাঙ্ক ছিল মাত্র তিনটি। সেই তিনটি ট্যাঙ্কই কব্জা করে অভ্যুত্থানের ফন্দি এঁটেছিল ফারুক। তার এই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার পর সেনাবাহিনীতে তা ফাঁস হয়ে যায়। ঊর্ধ্বতন

অফিসারদের সবাই ফারুকের অভ্যুত্থান সংগঠনের ফন্দির কথা জানতেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, এজন্য তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় নি। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, ১৯৭৪ সালে মিসরের কাছ থেকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ৩২টি ট্যাঙ্ক পাওয়ার পর গঠিত ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টটি সেই ফারুকের দায়িত্বেই ঢাকায় মোতায়েন করা হয়। ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টটির মোতায়েন সেনাপ্রধানের ভুল সিদ্ধান্তেরই পরিচায়ক। উল্লেখ্য, ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ট্যাঙ্ক যুদ্ধের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও সে কথাই বলে। মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ট্যাঙ্ক যুদ্ধগুলো হয়েছে যশোর, হিলি, কুমিল্লা এসব এলাকায়। সেনাপ্রধানের এই ভুল সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতালিপ্সু ষড়যন্ত্রকারী অফিসাররা পরবর্তীকালে বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে সামরিক বাহিনীতে সংঘটিত শৃঙ্খলার গুরুতর পরিপন্থী কাজের জন্য তিরস্কারের বদলে পরোক্ষভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এসব বিশৃঙ্খলার ধারাবাহিকতাই পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ভিত রচনা করেছে।

এ হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করা কি সম্ভব ছিল?

অনেকেই প্রশ্ন করেন, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল কি না। আমি মনে করি, এ হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল। সেনাপ্রধান এজন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। ডিএমআই (পরিচালক, সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতর) লে. কর্নেল (অব.) সালাহউদ্দিনের ভাষ্যানুযায়ী সেনাপ্রধান এই বিদ্রোহের কথা তাঁর কাছ থেকে অবহিত হন রাত প্রায় সাড়ে চারটায়। ডিএমআই-এ তথ্য দিয়েছিলেন ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার বিরুদ্ধে এক কোর্ট অফ এনকোয়ারির সময়। কাজেই এটিকে প্রামাণ্য বলে ধরা যায়। সেনাপ্রধান আমাকে ফোন করেন সকাল প্রায় ছ'টায়। ততোক্ষণে সব শেষ। ডিএমআই বলেছেন, সেনাপ্রধান তাঁর উপস্থিতিতে একের পর এক ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থানরত প্রায় সব ইউনিট কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন (এদের মধ্যে আমার অধীনস্থ ইউনিট কমান্ডাররাও ছিলেন)। তিনি সর্বশেষ কথা বলেন আমার সঙ্গে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা মহামূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। সেনাপ্রধান আমাকে সতর্ক করতে অহেতুক দীর্ঘ বিলম্ব করেন। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর প্রাণ রক্ষার জন্য সময়মতো ফোর্স পাঠানোর কোনো সুযোগই তাই আমার ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সেনাদলের সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে তাদেরকে অগ্রসরমান হত্যাকারীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া যেতো। কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে আসা ১২০ জন

এর ফলে আমার ব্রিগেডের কোনো গোপনীয় তথ্য পাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হই আমি।

সেনাবাহিনীর শীর্ষপদে রদবদল

২৪ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সেনা উপপ্রধান জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে ডেকে পাঠালেন। আমাকে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখলেন তিনি। তাঁর টেবিলে একটা রেডিও দেখলাম। একটু পর জিয়া সেটটি অন করলেন। তখন খবর হচ্ছিল। খবরে জানানো হলো, সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে প্রেষণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে। সেনাপ্রধান করা হয়েছে উপপ্রধান জিয়াকে। তাঁর স্থলে উপপ্রধান হয়েছেন তখন দিল্লিতে অবস্থানরত ব্রিগেডিয়ার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ঐদিনই রাতারাতি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করা হয় তাঁকে। নিতান্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের বাইরে অবস্থানরত এরশাদের এই দু'দুটো বিধিবহির্ভূত পদোন্নতি এবং উপপ্রধানের পদ লাভের সঙ্গে ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের কোনো যোগসূত্র আছে কি না, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। স্মর্তব্য, মেজর ডালিম ও গাজী গোলাম মোস্তফার বিরোধে এরশাদ ডালিমের পক্ষে শৃঙ্খলাবিরোধী জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন। এছাড়া মেজর রশিদ ও ব্রিগেডিয়ার এরশাদ উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় একই সময় দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। এসবের মধ্যে কোনো যোগসূত্র থাকাটা তাই অসম্ভব কিছু নয়।

পনেরো আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে এরশাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের প্রতি তার সহমর্মিতা লক্ষণীয়। পরবর্তী সময়ের দুটো ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি, খুব সম্ভবত, মেজর জেনারেল জিয়ার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নেয়ার পরবর্তী দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। আমি সেনাপ্রধানের অফিসে তাঁর উল্টোদিকে বসে আছি। হঠাৎ করেই রুমে ঢুকলেন সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ মেজর জেনারেল এরশাদ। এরশাদের তখন প্রশিক্ষণের জন্য দিল্লিতে থাকার কথা। তাকে দেখামাত্রই সেনাপ্রধান জিয়া বেশ রূঢ়ভাবে জিগ্যেস করলেন, তিনি বিনা অনুমতিতে কেন দেশে ফিরে এসেছেন। জবাবে এরশাদ বললেন, তিনি দিল্লিতে অবস্থানরত তার স্ত্রীর জন্য একজন গৃহভৃত্য নিতে এসেছেন। এই জবাব শুনে জিয়া অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, আপনার মতো সিনিয়র অফিসারদের এই ধরনের লাগামছাড়া আচরণের জন্যই জুনিয়র অফিসাররা রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে দেশের ক্ষমতা দখলের মতো কাজ করতে পেরেছে। জিয়া তাঁর ডেপুটি এরশাদকে পরবর্তী ফ্লাইটেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাকে বঙ্গভবনে যেতেও নিষেধ করলেন। এরশাদকে বসার কোনো সুযোগ না দিয়ে জিয়া তাকে একরকম তাড়িয়েই দিলেন। পরদিন ভোরে এরশাদ তার প্রশিক্ষণস্থল দিল্লিতে চলে গেলেন ঠিকই, কিন্তু সেনাপ্রধান জিয়ার নির্দেশ অমান্য করে রাতে তিনি

বঙ্গভবনে যান। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থানরত অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এর থেকেই মনে হয় এরশাদ আসলে তাদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করার জন্যই ঢাকায় এসেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরো পরের। জিয়ার শাসনামলের শেষদিকের কথা। ঐ সময় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী অফিসাররা গোপনে মিলিত হয়ে জিয়া সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করে। এক পর্যায়ে ওই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে তাদের সবাইকে ঢাকায় তলব করা হয়। সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে চক্রান্তকারী অফিসাররা যার যার দূতাবাস ত্যাগ করে লন্ডনসহ বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়। এদিকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন সদস্য একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হন। আরো অনেকের সঙ্গে লে. কর্নেল দীদারের দশ বছর এবং লে. কর্নেল নূরন্নবী খানের এক বছর মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। প্রধান আসামিরা বাংলাদেশের সরকার ও আইনকে বৃদ্ধাঙুলি দেখিয়ে বিদেশে নিরাপদেই অবস্থান করছিল। ঐ বিচার তাই একরকম প্রহসনেই পরিণত হয়।

পরবর্তীকালে, জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর অভ্যুত্থানকারীদের মধ্যে যারা চাকরি করতে চেয়েছিলেন, এরশাদ তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। দ্বিতীয়বারের মতো পুনর্বাসিত হলো ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা। পোস্টিং নিয়ে তাদের অনেকে বিভিন্ন দূতাবাসে যোগ দেয়।

শুধু পুনর্বাসনই নয়। এরশাদ আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত উল্লিখিত অফিসারদের কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতকালের প্রায় তিন বছরের পুরো বেতন ও ভাতার ব্যবস্থাও করে দেন। প্রায় একই সময়ে বিচারের হাত থেকে পালিয়ে থাকা ফেরারী প্রধান আসামিরা বিদেশী দূতাবাসে সম্মানজনক চাকরিতে নিযুক্ত হলেও একই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত তাদের সহযোগীরা বাংলাদেশে কারাবন্দি থাকে। কী অভিনব ও পক্ষপাতমূলক বিচার! প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, অভ্যুত্থানকারীদের প্রতি কি দায়বদ্ধতা ছিল প্রেসিডেন্ট এরশাদের যে, কর্মস্থল ছেড়ে তিন বছর আইনের হাত থেকে পালিয়ে থাকার পরও ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের বিচার অনুষ্ঠান এড়িয়ে গিয়ে তাদেরকে আবার চাকরিতে পুনর্বহাল করলেন তিনি? ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়াতেই অভ্যুত্থানকারীদের ঋণ শোধ করতে এরশাদ এ কাজ করেছিলেন কি না, এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ঘটনাপ্রবাহ থেকে একথা মনে করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে এরশাদের একটি পরোক্ষ কিন্তু জোরালো ভূমিকা ছিল। অবাক করার মতো ঘটনা যে এরশাদের উত্তরসূরি জিয়ার সহধর্মিণীর শাসনামলে ঐসব ফেরারী আসামিরা তাদের চাকরিস্থলে শুধু বহালই থাকেন নি, পদোন্নতিও পেয়েছিলেন।

২৪ আগস্টের ঘটনায় ফিরে আসি। আমি যখন সদ্য সেনাপ্রধান হিসেবে পদোন্নতি পাওয়া জেনারেল জিয়ার অফিসে বসে আছি, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) তখন পাঠানো হয় আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে। তিনি সেখানে গিয়ে ব্রিগেড মেজর হাফিজকে সঙ্গ দেন। এর উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে। তা হলো, আমাদের দু'জনকে সতর্ক পাহারার মধ্যে রাখা। জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে বসিয়ে রেডিওর খবর শুনিয়ে দিলেন হয়তো এজন্যই, যাতে কিছু আর বলতে না হয়। কিছুক্ষণ পর নতুন সেনাপ্রধান জিয়ার অফিস থেকে বাসায় ফিরে এলাম। একটু পরেই ফোন বেজে উঠলো। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠস্বর :

— রেডিওর খবর শুনেছো, শাফায়াত?

— হ্যাঁ স্যার, শুনলাম। ...স্যার, আপনি এই অবৈধ সরকারের অবৈধ আদেশ মানতে বাধ্য নন। আপনি এটা মানবেন না।

— তা কি হয়? আমার কথা কি কেউ শুনবে?

সেনাপ্রধান কি অবৈধ মোশতাক সরকারের বদলির নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না? খুনিদের সঙ্গ ত্যাগ করাই তো উচিত ছিল তাঁর। সেনাপ্রধান সেদিন যদি এটা করতেন তাহলে হয়তো পরবর্তী ইতিহাস অন্যভাবে লিখতে হতো। সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন তুলেই তিনি মোশতাককে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারতেন। একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারতেন তিনি। এবং ঐ মুহূর্তে জাতি সেরকম একটা কিছুই আশা করছিল। সেটা করা হলে দেশ ও জাতির ওপর দীর্ঘ অবৈধ সামরিক শাসনের জোয়াল চেপে বসতো না।

তৃতীয় পর্ব

ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর

অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট : খুনিদের হাতে জাতি জিম্মি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাপুরুষোচিত ও বর্বরতম এক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সংবিধান-বহির্ভূতভাবে ক্ষমতার পরিবর্তন হয় বাংলাদেশে। রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানসহ নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে দেশি-বিদেশি চক্রান্তকারীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগের একটি অংশ। এই বর্বর গোষ্ঠীকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমরা উৎখাত করি একই বছরের ৩ নভেম্বর।

বিগত একুশ বছর যাবৎ ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ওপর অনেক কালিমা লেপন করা হয়েছে। কেউ কেউ এটিকে 'রুশ-ভারতের চরদের' অভ্যুত্থান হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছেন। ১৯৭১ সালে আমরা অনেকেই জীবনবাজি রেখে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করেছিলাম। সম্মুখ-সমরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছি কেউ কেউ, আমরা এসবই করেছিলাম ফাঁসির রশি গলায় পড়বার ঝুঁকি নিয়ে। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ শুরু হয় প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার দ্বারা, চুপিসারে পক্ষত্যাগের মাধ্যমে নয়। তাই আমাদেরকে অন্য কোনো দেশের দালাল বা চর আখ্যায়িত করলে স্বাভাবিকভাবে তীব্র বেদনা অনুভব করি। আমাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার যোগ্যতা আর কারো আছে কি এই বাংলাদেশে?

বৈরী পরিবেশে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগের অনুপস্থিতিতে আগে কখনো কিছু বলি নি। এখন সুযোগ এসেছে জাতির কাছে, বিবেকবান মানুষের কাছে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার।

সেই অভ্যুত্থানে জড়িত, নিহত ও চাকরিচ্যুত সাহসী অফিসারদের আত্মত্যাগের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থেকে উৎসারিত বর্তমান প্রয়াস। মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তির সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ এবং বীর সেনানি কর্নেল হুদা চক্রান্তের শিকার হয়ে ৭ নভেম্বর নির্মমভাবে নিহত হন। অথচ এঁদের আত্মত্যাগেই জাতি একদল খুনির হাতে জিম্মি হয়ে থাকা অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এদিকে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল হায়দার ও আরো ১০ থেকে ১২ জন অফিসার (একজন মহিলা ডাক্তারসহ) এবং একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার

স্ত্রী নিহত হন ৭ নভেম্বর এবং তার পরবর্তী কয়েকদিনে। এদের কেউই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে কোনোভাবেই জড়িত ছিলেন না। তাঁরা সবাই নিহত হন জাসদ-এর সেই তথাকথিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' উদ্ভাবিত আত্মঘাতী এক শ্লোগানে প্রভাবিত এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্যদের হাতে। পরবর্তীকালে জিয়ার শাসনামলে এদের অনেকেই বিচারের সম্মুখীন হয়। কঠোর হাতে তাদের দমন করা হয়। 'দুর্বলের অত্যাচার যে কতো ভয়ঙ্কর'—এ সত্যটি জাতি হাড়ে হাড়ে টের পেতো ওদের দমন করা না গেলে।

শুরুতেই বলে নিই ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যগুলো কি ছিল :

ক. সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমাণ্ড পুনর্প্রতিষ্ঠা করা ;

খ. ১৫ আগস্টের বিদ্রোহ এবং হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করা ;

গ. সংবিধান-বহির্ভূত অবৈধ সরকারের অপসারণ, এবং

ঘ. একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির অধীনে গঠিত একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত সরকারের কাছে হস্তান্তর করা।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে বিদেশি শক্তির মদদ ছিল সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আশ্চর্যের বিষয়, দেশের সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা দপ্তর বা বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর স্থানীয় মিশনগুলো এই ষড়যন্ত্রের কোনো আগাম আভাস দিতে ব্যর্থ হয়। এর থেকে ধারণা করা যায়, এই চক্রান্তটি বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তর ও বিদেশি মিশনগুলো সযত্নে আড়াল করে রাখে।

১৫ আগস্ট ভোরে অভ্যুত্থান-প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেটা জানতে পারেন। তারও অনেক পরে ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে আমি বিষয়টি অবগত হই। যদিও প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার ছিল না, তবু যখন বিষয়টি আমার গোচরে আসে ততোক্ষণে সবই শেষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল ততোক্ষণে সম্পন্ন। অভ্যুত্থান-প্রক্রিয়া চলাকালে এই খবর জানতে পারলেও কোনো কিছু করার ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল। সময় ও অবস্থানের বিচারে সেনাপ্রধান ও আমি অভ্যুত্থানকারীদের থেকে অন্তত দুই ঘণ্টা পেছনে ছিলাম।

যে-কোনো অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টা নস্যাৎ করতে হলে Pre-emptive strike করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন আগাম গোয়েন্দা খবরাখবর। আমার অধীনে কোনো গোয়েন্দা ইউনিট ছিল না। ঢাকায় নিযুক্ত সবক'টি ইউনিট ছিল সেনা হেড কোয়ার্টারের অধীন। এ জাতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যেহেতু কোনো আগাম পূর্বাভাস কোনো দিন দেয়া হয় নি, সেহেতু ধারণা করি যে, বাংলাদেশের সব গোয়েন্দা সংস্থা ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান সম্পর্কে হয়

একেবারেই বেখবর ছিলেন অথবা সবাই অতি যত্নে সাফল্যের সঙ্গে এটিকে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন। অভ্যুত্থান একবার শুরু হয়ে গেলে করার আর বিশেষ কিছুই থাকে না। কারণ অনুগত ইউনিটগুলো বিদ্রোহীদের চাইতে কমপক্ষে দুই ঘন্টা পেছনে থাকে সময় ও অবস্থান এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের বিচারে।

ঘাতকদের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর সকাল ন'টার মধ্যেই তিন বাহিনী প্রধান অবৈধ খুনি সরকারের প্রধান খন্দকার মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এরপর থেকে সেনাবাহিনীর সকল কর্মকর্তা ও সদস্য শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা তথা সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ এড়ানোর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকেন।

অভ্যুত্থানকারীদের ক্ষমতা দখলের দুই দিনের মধ্যে দিল্লিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে কর্মরত কর্নেল মঞ্জুর (পরে মেজর জেনারেল ও নিহত) অপ্রত্যাশিতভাবে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। এর কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধুর খুনিদের দ্বারা নিয়োগকৃত ও সে সময়ে সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল এরশাদও অযাচিতভাবে বিনা ছুটিতে দেশে এসে উপস্থিত হন। জেনারেল এরশাদ তখন দিল্লিতে একটি সামরিক কোর্সে অংশ নিচ্ছিলেন। জিয়া তখন এরশাদকে অনাবশ্যক ও অনাহূতভাবে দেশে আসার জন্য তিরস্কার এবং বঙ্গভবনে যেতে নিষেধ করেছিলেন। সেখানে মোশতাকসহ অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহী মেজররা অবস্থান করছিলেন। কিন্তু এরশাদ বারণ সত্ত্বেও বঙ্গভবনে যান এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সলাপরামর্শে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুত্থানের অন্যতম হোতা রশিদও ১৫ আগস্টের মাস দুয়েক পূর্বে দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিধি লঙ্ঘন করে এরশাদকে কোর্সে অংশগ্রহণরত অবস্থায় প্রমোশন সহকারে পদোন্নতি দেয়া হয়। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও সিনিয়র তিনজন অফিসারকে ডিঙিয়ে (ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক, ব্রিগেডিয়ার সি. আর. দত্ত এবং ব্রিগেডিয়ার কিউ. জি. দস্তগীর) খুনিরা এরশাদকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ পদে নিযুক্তি দেয়।

২৪ আগস্ট জেনারেল জিয়া চিফ অফ স্টাফের ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। চিফ অফ স্টাফ হলেও দৃশ্যত তাঁর হাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। তাঁর ওপরে বসানো হলো চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ও প্রেসিডেন্টের ডিফেন্স এডভাইজারকে। এ দুটো পদে ছিলেন যথাক্রমে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান ও জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। সর্বোপরি ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আগে চিফ অফ স্টাফের ওপরে থাকতেন দু'জন। এখন হলেন চারজন। তদুপরি ছিল অভ্যুত্থানকারী মেজর সাহেবরা। তারা প্রত্যেকেই ছিল চিফ অফ স্টাফেরও বস! তারা ইচ্ছেমতো পোস্টিং দিচ্ছে, ট্রুপস্ মুভমেন্ট করাচ্ছে,

ছোটোখাটো সেনা অপারেশন করাচ্ছে। রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী তাদের হাতে প্রকৃত অর্থেই জিম্মি ছিল। আসলে সে ছিল এক অসহনীয় পরিবেশ।

ইতিমধ্যে অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়মিত হিসেবে আত্মীকরণ করা হয়েছিল। তাদেরকে বিভিন্ন ইউনিটে পোস্টিংও দেয়া হলো, যদিও কেউ তাতে যোগ দিল না। তাদের সকলেই ছিল যেন যাবতীয় সেনা আইনের ঊর্ধ্বে।

সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে জার্মানি থেকে নিয়ে আসা হয় ব্যবসায়ী গ্রুপ ক্যাপ্টেন এম.জি. তাওয়াবকে। তাওয়াব এর আগে পাকিস্তান বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন। সেও প্রায় বছর চারেক। বিমান বাহিনীর সকল নিয়মনীতি ও বিধি লঙ্ঘন করে নজিরবিহীনভাবে তাওয়াবকে বিমান বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হলো এক সঙ্গে দুটো প্রমোশন দিয়ে। একলাফে তাওয়াব অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন থেকে সক্রিয় এয়ার ভাইস মার্শাল হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাওয়াবের কোনো ভূমিকাই ছিলো না। একেই বলে ভাগ্য! উল্লেখ্য, উগ্র ডানপন্থী তাওয়াবকে আনতে রশিদ জার্মানি পর্যন্ত গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি একাধিকবার লিবিয়া ও পাকিস্তানে গিয়ে আঁতাতের চেষ্টা করেন।

সেনাবাহিনীর মধ্যে সমান্তরাল আরেকটা আর্মির মতো বহাল থাকতে লাগলো অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতরা। ফারুক-রশিদ অবস্থান করতো মোশতাকের সঙ্গে বঙ্গভবনে। বঙ্গভবনের ভেতরে ছিল ১২ থেকে ১৪টি ট্যাঙ্ক। বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মোতায়েন করা হয়েছিলো ১২টি এবং ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আরো ৮ থেকে ১০টি ট্যাঙ্ক। ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনী রয়ে গিয়েছিল সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ডের বাইরে। জেনারেল জিয়া, খলিল বা ওসমানী— এই তিন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার কারোরই নিয়ন্ত্রণ ছিল না তাদের ওপর। তারা শুধু মোশতাক, ফারুক ও রশিদের নির্দেশ শুনতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করতো।

অন্যদিকে ডালিম, নূর, শাহরিয়ার ও অন্যরা অবস্থান করতো বাংলাদেশ বেতার ভবনের অভ্যন্তরে। তারা ইঞ্জিনিয়ার্সের কিছু সৈন্য নিয়ে মুভমেন্ট করতো। লেফটেন্যান্ট মাজেদ নামে একজন অফিসারও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা এ সময় ঢাকা ও তার আশপাশের বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে ধরে এনে জোর করে টাকা-পয়সা আদায় করতো। অনেকেই তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, নির্যাতিতদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক আবিদুর রহমান এবং বিশিষ্ট রাজনীতিক তোফায়েল আহমদ। তোফায়েল আহমদের এপিএস-কে তো তারা মেরেই ফেলে।

এ সময় সেনাপ্রধান জিয়ার কমান্ড কতো নাজুক ছিল তার একটা উদাহরণ দেয়া যায়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সেনাসদর থেকে এক নির্দেশে বঙ্গভবনে তিনটি ট্যাঙ্ক রেখে বাকি সব ট্যাঙ্ক অবিলম্বে ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনতে বলা হলো। ৭ দিনের মধ্যেও বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐ নির্দেশ পালন করার কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না। তখন মুখরক্ষার জন্য বাতিল করা হলো আদেশটি।

রাজনৈতিকভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে মোশতাক সরকারের বেশ মাখামাখি দেখা যাচ্ছিল। একজন চিহ্নিত স্বাধীনতা-বিরোধী পীর মোহসেন উদ্দিন দুদু মিয়াকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য দূত হিসেবে সে দেশে পাঠানো হলো। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাকে চাকরি থেকে সরানোর পাঁয়তারা চলতে লাগলো। সবকিছু মিলিয়ে মনে হচ্ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে একটি কনফেডারেশন গঠনের দিকেই যেন এগিয়ে যাচ্ছে মোশতাক সরকার।

এর আগে, ১৯৭১ সালে খন্দকার মোশতাক এবং মাহবুব আলম চাষীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন একটি বৃহৎ শক্তির ছত্রছায়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনা করে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। সৌভাগ্য আমাদের, মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই চক্রান্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করে অঙ্কুরেই তা ধ্বংস করে দেন। আমার ধারণা, সেই বৃহৎ শক্তির বিরাগভাজন হওয়ার কারণেই পরবর্তীকালে জেলে অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন জাতীয় চার নেতা। বৃহৎ শক্তিটির দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত চর মোশতাকের নির্দেশে যে হত্যাকাণ্ডটি সজ্ঘটিত হয়েছিল, এখন আর সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে জারি করা একটি ফরমানের উল্লেখ করা যায়। নজিরবিহীন ঐ ফরমানের ভাষ্যে বলা হয়েছিলো, কোনো ব্যক্তি যদি দুর্নীতি করে, এমন কি তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে (reputed to be corrupt), তাহলে তাকে বিচারপূর্বক মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আমার ধারণা, অভ্যুত্থানকারীরা মোশতাকের প্রতিদ্বন্দ্বী সকল যোগ্য নেতাকে এই আইনের বলেই ফাঁসিতে ঝোলাতো। নিঃসন্দেহে এটা ছিল একটা জংলি আইন।

৭ নভেম্বরের পর আমি যখন তিন মাস জেলে ছিলাম, তখন শুনেছি জাতীয় নেতা শ্রদ্ধেয় তাজউদ্দিন আহমেদ পত্রিকায় ফরমান জারির খবর দেখে সহবন্দিদের বলেছিলেন, আমাদের আর বাঁচিয়ে রাখা হবে না। এ আইন তারই আলামত।

অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িতদের বিশৃঙ্খল ও উদ্ধত কার্যকলাপে সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। আমার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সেনাসদস্যরাও ছিল

অসন্তুষ্ট ও হতাশ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন আমি বাংলাদেশ বেতারে অবস্থান নেয়া বিদ্রোহী আর্টিলারি সেনাদল পরিদর্শনে গেলাম। সেখানে অবস্থানরত কতিপয় অফিসার সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে যে-কোনো পদক্ষেপ নেয়া হলে আমাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে বলে অঙ্গীকার করেন। বঙ্গভবনের মেইন গেটেও আমার অধীনস্থ প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি নিয়োজিত ছিল। ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে তাদের পরিদর্শনে গেলাম আমি একদিন। সেদিন বিকেলে জেনারেল জিয়া খবরটা শুনে খুবই খুশি হন। তিনিও ট্রুপ্‌স্‌ পরিদর্শনে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। জিয়া সম্ভবত তার কমান্ড সম্পর্কে তখনো সন্দিহান ছিলেন। পরদিন চিফ অফ স্টাফ জিয়াকে নিয়ে আবার ট্রুপ্‌স্‌ পরিদর্শনে গেলাম। বেতার ভবনে মোতায়েন আর্টিলারি এবং বঙ্গভবনের সামনে প্রথম বেঙ্গলের ট্রুপ্‌স্‌ ও পাশেই অবস্থানরত ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের অফিসার এবং জওয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন জিয়া। বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ শুনলেন। এ সময় তাকে বেশ তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল।

প্রতিরোধের প্রস্তুতি : খালেদ মোশাররফ বললেন, 'ডু সামথিং'

১৫ আগস্টের পর থেকেই অভ্যুত্থানকারী খুনিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার একটা চিন্তা কাজ করছিল আমার মধ্যে। সমমনা কিছু অফিসারের মৌন সমর্থনও আমার পেছনে ছিল জানতাম। ১৯ আগস্ট সেনাসদরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে ফারুক ও রশিদের উপস্থিতিতে আমি এই বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করি যে, দেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হবে। অবৈধ খুনি প্রেসিডেন্ট মোশতাককে আমি মানি না এবং প্রথম সুযোগেই আমি তাকে পদচ্যুত করবো। অফিসারদের অনেকেই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার তাগিদ ও নৈতিক সমর্থন দিচ্ছিলেন আমাকে। সেনা আইনে এগুলো গর্হিত অপরাধ। কিন্তু ১৫ আগস্টের অপরাধের যখন কোনো প্রতিকার হয় নি, তখন দেশের রাষ্ট্রপতির হত্যাকারীদের বিরুদ্ধাচরণ করায় কি দোষ থাকতে পারে?

অক্টোবর নাগাদ চিফ অফ স্টাফ জিয়া অভ্যুত্থানকারী সেনা অফিসারদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপের গুরুতর অনুযোগ করলেন আমার কাছে। আমি তাঁকে বললাম, 'স্যার আপনি চিফ, আপনি অর্ডার করলে আমি জোর করে এদের চেইন অফ কমান্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।' কিন্তু জিয়া ভুগছিলেন দোটানায়। ১৫ আগস্টের ভয়াবহ ঘটনাবলি তাঁকে কিছুটা বিমূঢ় করে দিয়েছিল। তখন তিনি একপা এগোন তো দু-পা পিছিয়ে যান। মনে হলো, চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারছেন না জিয়া। যা করার নিজেদেরকেই করতে হবে।

কিছু একটা করতে চাইছিলাম। কিন্তু তখন পক্ষ-বিপক্ষ চেনা ছিল খুবই দুরূহ। তবে বুঝতে পারছিলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও অন্যান্য শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নীতিবান কিছু অফিসারের সমর্থন আমি পাবো।

অক্টোবরের মাঝামাঝি কোনো একদিন সেনাসদরে একজন পিএসও-র অফিসে রক্ষীবাহিনীর দুই প্রভাবশালী কর্মকর্তা আনোয়ারুল আলম শহীদ ও সারোয়ারের সঙ্গে অবৈধ সরকারকে প্রতিরোধ করার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করি। তারা আমার সঙ্গে একমত হলেন। আমি একথা বলার সময় পিএসও অফিস কক্ষের বাইরে ছিলেন। তিনি অফিসে ফিরতে ফিরতে আমার কথা খানিকটা শুনে ফেলেছিলেন। রুমে ঢুকে পিএসও বললেন, 'স্যার, আপনি যদি এসব ষড়যন্ত্র করেন আমি রিপোর্ট করবো।' এই ছিল তখন সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার মানসিক অবস্থা। ভীত সন্ত্রস্ত সবাই। উল্লেখ্য, সামরিক বাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর ইউনিটগুলোর আত্তীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল সে সময়।

অক্টোবরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ওসমানী বঙ্গভবনে সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের একটা কনফারেন্স ডাকেন। বঙ্গভবনের ভেতরে সেটাই আমার প্রথম প্রবেশ-ঘটনা। কনফারেন্সে ওসমানী সবাইকে রাষ্ট্রপতি মোশতাক ও তার সরকারের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেন। যে-কোনো রকম অবাধ্যতা সমূলে উৎখাত করা হবে বলে জানালেন তিনি। ওসমানী এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সিনিয়র জেসিও-দের কাছে ডেকে নিয়ে বলতে লাগলেন, যারা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা ভারতীয়দের প্ররোচনাতেই তা করবে, তারা সব ভারতীয় এজেন্ট। এসব কথা বলে, ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুত্থান-বিরোধীদের 'ভারতের দালাল' লেবেল সেঁটে দেয়া হলো। অক্টোবরের শেষ নাগাদ ৪৬ ব্রিগেডের বিকল্প গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কর্নেল মান্নাফের (পরে মেজর জেনারেল অব.) অধীনে সাভারে আরেকটি ব্রিগেড গঠন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। দৃশ্যত ঢাকা ব্রিগেডের ক্ষমতা সীমিতকরণের লক্ষ্যেই সেটা করা হয়েছিল। এসব থেকে আমার ধারণা হলো, বেশিদিন আর অপেক্ষা করা যাবে না।

অক্টোবরের শেষার্ধে সেনাবাহিনীর প্রমোশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য মেজর র‍্যাঙ্কের অফিসারদের যোগ্যতার ভিত্তিতে লে. কর্নেল র‍্যাঙ্কে পদোন্নতি দেয়া। রশিদ, ফারুক ও ডালিমের নামও এই বোর্ডে উপস্থাপিত হয় বিবেচনার জন্য। প্রমোশনের পরিবর্তে তাদের বিচারের ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করি আমি। আমাকে সমর্থন করেন তৎকালীন বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল কিউ.জি. দস্তগীর, ব্রিগেডিয়ার সি. আর. দত্ত এবং কুমিল্লার ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল আমজাদ আহমেদ চৌধুরী। দুঃখের বিষয়, সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ে আমাদের বিরোধিতা খড়কুটোর মতো ভেসে যায়।

দস্তগীর সম্পর্কে আর একটি কথা বলতেই হয়। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের

পর গোটা বাংলাদেশে যেখানে হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদও হয় নি, সেখানে দস্তগীর তার নিজের দায়িত্বে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের কোনো কোনো নেতাকে প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান-প্রত্যাগত এই অফিসারটি তখন চট্টগ্রামের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা যে-কোনো কারণেই হোক মিছিল বের করা থেকে নিবৃত্ত থাকেন।

অক্টোবরের ২৮/২৯ তারিখ হবে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে বললেন, 'কিছু কী ভাবছো? এরকমভাবে দেশ ও আর্মি চলতে পারে না। জিয়া এগিয়ে আসবে না। ডু সামথিং।' ব্রিগেডিয়ার খালেদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের আলাপ হয়েছিল এ ব্যাপারে। খালেদ আমার মত চাইলেন। আমি বললাম, 'আপনি দিন-তারিখ বলেন। আমি প্রস্তুত।'

২৯ অক্টোবর রাত ১১টায় জিয়া আমাকে তাঁর অফিসে ডাকলেন। ডেকে আমাকে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে মেজর শাহরিয়ার অশালীন ব্যবহার করেছে। জিয়া বললেন, 'এরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। ট্যাঙ্কগুলো থাকাতেই ওদের এতো ঔদ্ধত্য। তুমি একটা এক্সারসাইজের আয়োজন করে ট্যাঙ্কগুলো সাভারের দিকে নিয়ে যাও।' আমি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইলাম, কবে নাগাদ এটা করবো। জবাবে জিয়া বললেন, 'জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে করো।' আমি চুপসে গেলাম। আমরা ভাবছিলাম দু'একদিনের মধ্যেই কিছু করার কথা, আর জিয়া কি না ট্যাঙ্ক বাইরে নিতে বললেন আরো ২/৩ মাস পর! আমার মনে হলো, জিয়াকে নিয়ে কিছু করা যাবে না। বরং খালেদ মোশাররফের সঙ্গেই কাজ করা যাক। ১ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ও আমি খালেদের অফিসে বসলাম। বিস্তারিত আলোচনার পর খালেদ সিদ্ধান্ত দিলেন ২ নভেম্বর দিবাগত রাত দুটোয় বঙ্গভবনে মোতায়েন আমার দুটো কোম্পানি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে আসবে, সেটাই হবে আমাদের অভ্যুত্থান সূচনার ইঙ্গিত।

অভ্যুত্থান শুরু

পরিকল্পনামতো রাত তিনটায় বঙ্গভবনে মোতায়েন প্রথম বেঙ্গলের কোম্পানি দুটো ক্যান্টনমেন্টে চলে এলো। আমার স্টাফ অফিসারবৃন্দ— মেজর নাসির, মেজর ইকবাল, মেজর মাহমুদ এবং এম.পি. অফিসার মেজর আমিন অভ্যুত্থান শুরুর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সেনাপ্রধান জিয়াকে ১৫ আগস্টের খুনি বিদ্রোহকারীদের কবল থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহর নেতৃত্বে প্রথম বেঙ্গলের এক প্লাটুন সেনা পাঠানো হলো তাঁকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখতে। মেজর নাসির ও মেজর আমিনকে পাঠালাম

ট্যাঙ্ক বাহিনী হেড কোয়ার্টারে। নাসির ট্যাঙ্ক বাহিনীর অফিসার ছিল বলে সুবিধা হবে ভেবে তাকেই সেখানে পাঠাই। এর আগে আমি একদিন ট্রুপস্ পরিদর্শনে গেলে রেডিওতে মোতায়েন গোলন্দাজ বাহিনীর কোনো কোনো অফিসার আমাকে গোপনে যে আভাস দিয়েছিল, সে কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

কিন্তু ট্যাঙ্ক বাহিনীতে গিয়ে মেজর নাসির ও মেজর আমিনের অভিজ্ঞতা হলো উল্টো। উদ্দেশ্য শুনে তাদেরকে বন্দি করে ফেলা হলো। বঙ্গভবনে থেকে ফারুক তাদের মেরে ফেলার হুকুম জারি করলো।

অন্যদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ জিয়ার বাসায় গিয়ে তাঁকে প্রোটেক্টিভ কাস্টডিতে এনে নিষ্ক্রিয় করে ফেললো। তাঁর বাসার টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলো। খুনি মোশতাক-রশিদ চক্রের কবল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

টিভি ও রেডিওতে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির যে অফিসাররা অবস্থান করছিল তারা আমার নির্দেশে ঠিক দুটোয় ফারুক-রশিদের আনুগত্য ত্যাগ করে রেডিও-টিভি বন্ধ করে দেয়। আমার ওসি সিগন্যাল কোম্পানির মেজর মূসা কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। সেনাসদরের মেজর দিয়াকত (পরে লে. কর্নেল অব.) এ ব্যাপারে তাকে পুরোপুরি সহযোগিতা করে।

বঙ্গভবনে মোতায়েন বিদ্রোহীদের ট্যাঙ্ক আক্রমণের চেষ্টা করলে তা প্রতিহত করার জন্য সোনারগাঁও হোটেলের ক্রসিংয়ে পাঠানো হলো এক কোম্পানি সৈন্য। এক কোম্পানি পাঠানো হলো সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়েও। এই কোম্পানি দুটো ছিল প্রথম বেঙ্গলের। ৩ নভেম্বর সকাল আটটার মধ্যে এরা অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ক্যান্টনমেন্টস্থ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টার থেকে যাতে হামলা না আসতে পারে সেজন্য দ্বিতীয় বেঙ্গলের ২ কোম্পানি গেলো রাস্তা বন্ধ করতে। বিমানবন্দরের রানওয়ের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রইলো বঙ্গভবন থেকে প্রত্যাহৃত ২টি কোম্পানি।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন অফিসার হলেন রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত একটি পদাতিক সেনা ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল আবদুল গাফফার হালদার। লে. কর্নেল গাফফার ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের বিদ্রোহী ট্যাঙ্কগুলো যাতে আমাদের হেড কোয়ার্টারে হামলা চালাতে না পারে, সেজন্য ৩ নভেম্বর সকাল আটটার মধ্যেই স্টাফ রোড রেলওয়ে ক্রসিংয়ে রোডব্লক স্থাপন করেন।

চতুর্থ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসারের দফতরে আমাদের থাকার কথা ছিল রাত দুটোয়। আমি তখন থেকে সেখানে অবস্থান গ্রহণ করি। কিন্তু খালেদ মোশাররফ বা নুরুজ্জামান কারোরই দেখা নেই। এতোদিন অন্য যারা প্রতিনিয়ত বলতেন একটা কিছু করার জন্য, তাদেরও দেখা নেই। রুদ্ধশ্বাস

দীর্ঘ অপেক্ষার পর খালেদ মোশাররফ এলেন শেষ রাতে চারটার দিকে।

ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এসেছিলেন সকালে। ততোক্ষণে হেলিকপ্টার ও মিগ ফাইটার আকাশে। যাহোক, আমরা গুটিকয়েক লোক যখন অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছি, শুনতে পেলাম দ্বিতীয় বেঙ্গলের সিও লে. কর্নেল আজিজুর রহমান (বর্তমানে মে. জেনারেল) হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অবশ্য তার বদলে তার অধীনস্থ ক্যাপ্টেন নজরুল ২ কোম্পানি সৈন্য নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়। সিও সাহেব বোধহয় ভোরবেলা আকাশে হেলিকপ্টার আর মিগ দেখে আশ্বস্ত হন যে সাফল্য আমাদের নিশ্চিত। তিনি সকাল হয়ে যাওয়ার পর এসে হাজির হন এবং অতি উৎসাহ দেখাতে থাকেন।

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বরের আগ পর্যন্ত এই কমান্ডিং অফিসারটি বেশ কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দেন। তাঁর অধীনস্থ কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন নজরুলকেও একবার তিনি সঙ্গে করে আনেন। অথচ একই ব্যক্তি ৭ নভেম্বরের বিপর্যয়ের পর অবলীলায় রাজসাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তৎকালীন সামরিক কর্তৃপক্ষ এই অফিসারটিকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ায়। তাকে দিয়ে বলানো হয় যে, আমাদের সঙ্গে নাকি ভারতীয়দের যোগসাজশ ছিল। কী জঘন্য মিথ্যাচার! তার মিথ্যা সাক্ষ্য আমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য ছিল যথেষ্ট। বিচার তো আর করতে পারে নি জিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা! সে কথায় পরে আসছি।

যাই হোক স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর সহায়তা নিশ্চিত করা হয়। ২ নভেম্বর মধ্যরাতে স্কোয়াড্রন লিডার ও ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পর্যায়ের ১০ জন অফিসার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে রাতে জঙ্গিবিমান ওড়ানোর সুবিধা ছিল না। তবে বিমান বাহিনীর অফিসাররা কথা দিলেন ফার্স্ট লাইটে অর্থাৎ কাকডাকা ভোরেই তারা বিমান ওড়াবেন। তারা তাদের কথা রেখেছিলেন। ভোরে তারা একটি হেলিকপ্টার ও একটি ফাইটার যথাসময়ে আকাশে উড়িয়েছিলেন, যা দেখে বিদ্রোহীরা হতভম্ব হয়ে যায়।

বিমান বাহিনীর এই অসমসাহসী অফিসাররা মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে তাদের বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো শান্তিকালীন অবস্থান থেকে যুদ্ধকালীন সশস্ত্র অবস্থানে রূপান্তরিত করে কাকাডাকা ভোরে ফাইটার প্লেন এবং হেলিকপ্টার উড়িয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের এই ক্ষিপ্রতায় হতভম্ব ও হতাশ হয়েই ১৫ আগস্টের খুনিরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, বদরুল আলম, জামাল এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশিদ, সালাহউদ্দিন, ওয়ালী, মিজান এবং ফ্লাইং অফিসার কাইয়ুম ও ফরিদুজ্জামান সেদিন এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ বিমানের একজন বৈমানিক

ক্যাপ্টেন কামাল মাহমুদও আমাদের পক্ষে সেদিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তাদের এই অবদানের কথা স্মরণ করি।

অভ্যুত্থানের প্রথম দিন

ভোর হতে-না-হতেই চতুর্থ বেঙ্গলের অফিসে আমরা যে হেড কোয়ার্টার করেছিলাম, সেখানে অনেক অফিসার এসে সমবেত হলেন আমাদের সমর্থনে। মনে রাখা দরকার, রাত দুটোয় আমার দুইজন স্টাফ অফিসার ছাড়া কেউ ছিল না সেখানে। এখন অফিসারের ভিড়ে আমি বসার জায়গা পাই না। অসংখ্য অফিসারের মধ্যে বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। বিমানবাহিনীতে আমাদের সমর্থক অফিসাররা যেসব ফাইটার ও হেলিকপ্টার আকাশে উড়িয়েছিলেন, সেগুলো সারাদিন পর্যায়ক্রমে বঙ্গভবন আর ক্যান্টনমেন্টের উত্তরে অবস্থিত ট্যাঙ্ক বাহিনী ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ওপরে (যেখানে কিছু বিদ্রোহী সেনা ও ট্যাঙ্ক ছিল) বিমান আক্রমণের মহড়া চালায়। কোনো ট্যাঙ্ক বিন্দুমাত্র মুভ করা মাত্রই সেগুলোর ওপর আঘাত হানার জন্য তৈরি ছিলেন বিমানবাহিনীর অকুতোভয় পাইলটরা। তারা আমার কাছে বারবার অনুরোধ করছিলেন air strick-এর অনুমতি চেয়ে। কিন্তু খালেদ মোশাররফ ও আমি এই সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম যে, ভ্রাতৃহত্যার কোনো প্রয়োজন নেই।

সকাল আটটা নাগাদ রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল হুদা টেলিফোনে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কর্নেল হুদা বলেন, আমাদের প্রয়োজনে যে-কোনো সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত রয়েছেন। এরপর সারা দিনই তিনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন।

নারী ও শিশুসহ নিরস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যাকারীরা সবসময়ই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। প্রতিরোধের সাহস তাদের থাকে না। এ ক্ষেত্রে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা এক রকম বিনা প্রতিরোধেই আত্মসমর্পণ করে। তাদের পরাভূত করতে একটি গুলিও খরচ করতে হয় নি। টেলিফোন যুদ্ধেই পরাজয় মেনে নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে তারা।

৩ নভেম্বর ভোর থেকে শুরু হয় ১৫ আগস্টের হত্যাকারী বিদ্রোহী অফিসার তথা ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে টেলিফোনে আমাদের বাক-যুদ্ধ। আমাদের দিকে খালেদ মোশাররফ এবং ওদিকে পর্যায়ক্রমে রশিদ, জেনারেল ওসমানী, সর্বোপরি, খন্দকার মোশতাক। দুপুরের পর আমাদের পক্ষ থেকে একটি negotiation team পাঠানো হয় বঙ্গভবনে ৩/৪ জন অফিসারের সমন্বয়ে। খুনিরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। তারা সংঘাতের পথ বেছে নেয়। প্রথমে তারা গরম গরম কথা বললেও সারা দিন হেলিকপ্টার ও মিগের মহড়া দেখে ক্রমশ বিচলিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্ট

মোশতাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ওসমানী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশত্যাগের জন্য সেফ প্যাসেজের অঙ্গীকার দাবি করলেন। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয় ও বেসামরিক নাগরিকের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দেশত্যাগের সেফ প্যাসেজ দিতে রাজি হলাম আমরা। সে-সময় এটা আমাদের মনে ছিল যে, বিদেশে চলে গেলেও প্রয়োজনে পরে ইন্টারপোলের সাহায্যে তাদের ধরে আনা যাবে। ঠিক হলো, ফারুক-রশিদ গংকে ব্যাঙ্কক পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে বিমানবাহিনী প্রধান এম.জি. তাওয়াব।

ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে আমাদের টেলিফোনে যখন বাকযুদ্ধ চলছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও আমরা জানতে পারি নি জেলে চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ডের কথা। অথচ আগের রাতেই সংঘটিত হয়েছিল ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ড। ওসমানী ও খলিলুর রহমান ঐ ঘটনার কথা তখন জানতেন বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু তারা আমাদের কিছুই জানান নি। জানালে এভাবে ১৫ আগস্টের খুনিদের নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হতো না। আমাদের নেগেসিয়েশন টিমকেও এ বিষয়ে কেউ কিছু আভাস দেয় নি।

ইতিমধ্যে দুপুর দুটোর দিকে জিয়া তার পদত্যাগপত্র জমা দেন। তিনি আমাকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য খবর পাঠান ; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য সেটা হতো কিছুটা বিব্রতকর। জিয়ার সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। একাত্তরে একসঙ্গে যুদ্ধ করেছি আমরা। সব মিলিয়ে আমি একটা বিব্রতকর অবস্থায় ছিলাম বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। তবে জিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার ভার আমার ওপর ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, নিজেদের ক্ষমতা সংহত করার পর জিয়াকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দেবো। ৩ নভেম্বর রাত এগারোটায় খুনিচক্র ব্যাঙ্কক অভিমুখে রওনা হয়। ঢাকা থেকে ওড়ার পর রিফুয়েলিংয়ের জন্য তারা চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে একবার নেমেছিল।

এ সময়ের মধ্যে চতুর্থ বেঙ্গলের সিও লে. কর্নেল আমিনুল হককে বদলি করে তার জায়গায় বসানো হলো লে. কর্নেল আবদুল গাফফার হালদারকে। আমিনুল হককে খালেদ মোশাররফের পিএস করা হয়। এ ঘটনায় আমিনুল হক ক্ষুব্ধ হন। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের সময়ও খালেদ আমিনুল হককে তার সেক্টর থেকে অন্যত্র বদলি করেছিলেন। আমার ধারণা, মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই খালেদ মোশাররফ সম্ভবত তার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই অফিসারটি পরে ৭ নভেম্বর জাসদ ও কর্নেল তাহেরকে কোণঠাসা করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন জিয়ার পক্ষ নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী চক্রের সেনা অফিসাররা প্রায় সবাই ব্যাঙ্কক চলে যায়। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন, আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিনকে

সম্ভবত কৌশলগত কারণে দেশে রেখে যাওয়া হয়। এ অফিসারটি ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বাসভবন লক্ষ্য করে একটি আর্টিলারি গান দিয়ে সরাসরি ৭/৮ রাউন্ড ফায়ার করেছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট ঐ গোলায় মোহাম্মদপুর এলাকায় কয়েকজন বেসামরিক লোক হতাহত হয়।

৭ নভেম্বর রাতে এই মেজর মহিউদ্দিনই তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে জিয়াকে মুক্ত করে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে নিয়ে আসে।

অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিন : মোশতাককে গৃহবন্দি করা হলো

৪ নভেম্বর সকাল দশটা নাগাদ স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই.এ. চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ মোশাররফ চতুর্থ বেঙ্গলের হেড কোয়ার্টারে এলেন। তাদের মুখেই প্রথম শুনলাম জেল হত্যাকাণ্ডের কথা। এ ঘটনার কথা শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আগ পর্যন্ত কয়েক দিনের জন্য মোশতাককে স্বপদে বহাল রাখতে চেয়েছিলেন খালেদ মোশাররফ, যা আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও সব দিক বিবেচনা করে মেনে নিই। চার জাতীয় নেতাকে জেলখানায় এভাবে হত্যা করার কথা শুনে আমি খালেদ মোশাররফকে বললাম, 'মোশতাককে এক্ষুণি অপসারণ করুন আপনি।'

দুপুর এগারোটার দিকে খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে গেলেন, যেখানে মোশতাক তার রাজনৈতিক সহযোগীদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন। আমি হেড কোয়ার্টারে রইলাম সারা দিন। প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত বসে আছি। চারদিকে নানা গুজব, নানা আশঙ্কা। অফিসারদের অনেকেই বেশ উত্তেজিত। তারা বলছেন, এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে অভ্যুত্থান কেন করলাম আমরা!

ছ'টার দিকে তিনজন অফিসারকে নিয়ে বঙ্গভবনে গেলাম আমি। গিয়ে দেখি প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারির কক্ষে খালেদ মোশাররফ, তাওয়াব এবং এম. এইচ. খান বসে আলাপ করছেন। দেখে মনে হলো, বেশ হালকা মেজাজেই আছেন তারা। বঙ্গভবনে তখন কেবিনেট মিটিং চলছিল। খালেদকে আমি একটু গম্ভীরভাবেই বললাম, আপনি এগারোটার সময় এখানে এলেন আর সারা দিন কিছুই হলো না, কিছুই জানালেন না। মোশতাক বৈঠক করছেন, ওদিকে অফিসাররা ক্ষিপ্ত। খালেদ অবস্থাটা বুঝতে পারলেন মনে হলো। তিনিসহ আলাপরত তিনজনই উঠে বাইরে চলে গেলেন। আমি যাদের নিয়ে গিয়েছিলাম তাদের নিয়ে বসলাম। হঠাৎ উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার শুনতে পেলাম। মোশতাকের কণ্ঠ। তিনি বলছেন, 'I have seen many Brigadiars and Generals of Pakistan Army. Don't try to teach me!'

দরজা খুলে বেরিয়ে আমরা দেখি করিডোরে মোশতাক উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন খালেদ মোশাররফের সঙ্গে। মোশতাকের পাশে দাঁড়িয়ে ওসমানী। ৪ নভেম্বর সকালে প্রথম বেঙ্গলের দুটো কোম্পানিকে বঙ্গভবনের নিরাপত্তার জন্য

মোতায়েন করা হয়েছিল। একটি কোম্পানির নেতৃত্বে ছিলেন মেজর ইকবাল (পরে অব. এবং মন্ত্রী)। করিডোরে ইকবাল ও শ' খানেক সৈন্যও ছিল। মেজর ইকবাল মোশতাকের কথার জবাবে ততোধিক উত্তেজিত হয়ে বললো, 'You have seen the Generals of Pakistan Army. Now you see the Majors of Bangladesh Army'. এর মধ্যে সৈনিকরা গুলি চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল। ওসমানী সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করতে পেরে আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'Shafat save the situation. Don't repeat Burma!' আমি গিয়ে ইকবাল ও মোশতাকের মধ্য দাঁড়ালাম। ইকবালকে বললাম, 'তুমি সরে যাও,' আর মোশতাককে বললাম কেবিনেট কক্ষে ঢুকতে। কেবিনেট কক্ষে আমিও ঢুকলাম। দেখি এক প্রান্তে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান বসা। তাকে দেখেই আমি তুললাম জেল হত্যাকাণ্ডের কথা। তাকে লক্ষ্য করে বললাম, 'আপনি চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, প্রায় ৪০ ঘন্টা হয়ে গেছে জেলখানায় জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, তারও ঘন্টা কুড়ি পর দেশ ত্যাগ করেছে খুনিরা, আপনি এসবই জানেন কিন্তু আমাদের বলেন নি কিছুই। এই ডিসগ্রেসফুল আচরণের জন্য আমি আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।' খলিল কোনো কথা বললেন না। আমি যখন এদিকে ব্যস্ত, কেবিনেট কক্ষে তখন খালেদ মোশাররফের এডিসি ক্যাপ্টেন হুমায়ুন কবির ও কর্নেল মালেক (পরে অব. এবং ঢাকার মেয়র) ভাষণ দিচ্ছিলেন। যাই হোক, এরপর আমি মোশতাককে ধরলাম। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদা রক্ষা করেই বললাম, 'স্যার, আপনি আর এই পদে থাকতে পারবেন না। কারণ আপনি একজন খুনি। জাতির পিতাকে হত্যা করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন। জেল হত্যাকাণ্ড আপনার নির্দেশে হয়েছে। এসব অপরাধের জন্য বাংলার জনগণ আপনার বিচার করবে। আপনি অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। আপনার পদত্যাগের পর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হবেন।' আমি একথা বলা মাত্রই মন্ত্রী ইউসুফ আলী প্রতিবাদ করে বললেন, 'কোন্ বিধানে এটি হবে?' তিনি আরো বললেন, 'প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার অনুপস্থিতিতে স্পিকার হবেন প্রেসিডেন্ট।' আমি জবাব দিলাম, 'খন্দকার মোশতাক যে বিধানে আজ প্রেসিডেন্ট একই বিধানে প্রধান বিচারপতিকে প্রেসিডেন্ট করতে হবে। মোশতাককে ক্ষমতায় বসানোর জন্য যেমন সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, এক্ষেত্রেও তেমনি করতে হবে।' ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করার জন্যও তাকে আমি চাপ দিলাম। জিয়ার পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং খালেদকে নিযুক্তি দিতে মোশতাক প্রথমে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, ব্যাপারটা নিয়ে তিনি ওসমানীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান। যাই হোক, আমার অনমনীয়তায় শেষ পর্যন্ত মোশতাক এটা মেনে নিতে বাধ্য হন।

আমি মিটিং কক্ষে ঢোকার আগে কেবিনেট জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে লোক দেখানো তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। আমি বললাম, ঐ কমিটিতে কাজ হবে না। হাইকোর্টের বিচারকের নিম্নপদের কেউ এতে থাকতে পারবে না। এ কথা বলে আমি বেরিয়ে এলাম।

কর্নেল মালেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব নিলেন। মোশতাকের পদত্যাগপত্র, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে প্রমোশনসহ চিফ অফ স্টাফ করা এবং জেলহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনসহ বিভিন্ন কাগজপত্র তৈরি হলো। প্রেসিডেন্ট মোশতাক তাতে সই করলেন।

এদিকে, খালেদের পিএস লে. কর্নেল আমিনুল হক জেলহত্যার ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করলেন। ৬ নভেম্বর টেপটা আমি পাই। ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আমার অফিসের চেস্ট অফ ড্রয়ারে সেটা রাখি। পরে আর কখনো হেড কোয়ার্টারে যেতে পারি নি আমি। ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর ব্রিগেড কমান্ডারের দায়িত্ব পান আমিনুল হক। তিনিই এই টেপের কথা বলতে পারবেন।

মোশতাককে গৃহবন্দি করে রাখা হলো প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটে। তার মন্ত্রীদের মধ্যে ১৫ আগস্টের ও জেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমান, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে পাঠানো হলো সেন্ট্রাল জেলে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের পর রাত বারোটার দিকে বঙ্গভবন থেকে বাসায় ফিরে এলাম আমি।

অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিন : ক্ষমতা দখল করতে চান নি খালেদ মোশাররফ

৫ নভেম্বর সকালে বিডিআর-এর ডিজি মেজর জেনারেল দস্তগীর আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আসেন। প্রবীণ ও আস্থাভাজন মেজর জেনারেল দস্তগীরকে আমি অচলাবস্থার কথা উল্লেখ করে জানাই, সেনা হেড কোয়ার্টার কোনো কিছুতেই উদ্যোগ নিচ্ছে না। তড়িৎগতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য খালেদ মোশাররফের ওপর প্রভাব খাটাতে আমি তাকে অনুরোধ করলাম। দু'দিন ধরে রেডিও-টিভি বন্ধ। দেশময় উৎকণ্ঠা, নানা আশঙ্কা। ইতিমধ্যে আমি এবং আরও অনেকে খালেদ মোশাররফকে বারবার অনুরোধ করি রেডিও-টিভিতে জাতিকে সবকিছু অবহিত করে একটা ভাষণ দেয়ার জন্য। খালেদের এক কথা, নতুন প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল ভাষণ দেবেন।

খালেদ মোশাররফ সম্পর্কে অনেক মিথ্যাচার হয়েছে এদেশে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি দেশের ক্ষমতা দখল করতে চান নি এবং করেনও নি। বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে চান নি। ক্ষমতা দখলের লোভ থাকলে তিনি সেটা অনায়াসেই করতে

পারতেন। ক্ষমতালোভী বা উচ্চাভিলাষী কোনোটাই ছিলেন না খালেদ মোশাররফ। তিনি ছিলেন শৃঙ্খলার প্রতি নিবেদিত একজন দক্ষ সেনানায়ক। তাঁর সেনাপ্রধান নিযুক্তি অথবা প্রমোশন তিনি নিজের উদ্যোগে নেন নি। আমরা আমাদের প্রয়োজনে তাঁকে সেটা করেছিলাম।

যাই হোক, ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার থেকেই প্রেসিডেন্টের ভাষণের একটা কপি তৈরি করলাম আমরা। মেজর জেনারেল দস্তগীরকে সঙ্গে করে সেনাসদরে গেলাম। বেশ কয়েকজন (১৫/২০ জন হবে) সিনিয়র অফিসারকে নিয়ে খালেদ মোশাররফ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য বৈঠকে বসলেন। আমাদের তৈরি ভাষণের খসড়া নিয়ে প্রায় সারাদিন আলোচনা করলেন তিনি। এ ভাষণটিই প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশে পাঠ করেন নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েম।

রাষ্ট্রপতি সায়েমের ভাষণে আমাদের অগোচরে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেটি হচ্ছে সংসদ ভেঙে দেয়া। পরে শুনেছি খন্দকার মোশতাকের আস্থাভাজন শফিউল আজম (যিনি বঙ্গভবনে একজন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে অবস্থান করছিলেন) অনাকাঙ্ক্ষিত এই কাজটি করেন। বিচারপতি সায়েমের ভাষণের মূল ভাষ্য ছিল ৬ মাসের মধ্যে নতুন নির্বাচন হবে, আইনশৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠা করা হবে, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরবে ইত্যাদি। সবাইকে যার যার দায়িত্ব নির্ভয়ে পালন করতে বলা হলো। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ড করেছে উচ্ছৃঙ্খল কিছু সেনাসদস্য, যার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর নয় এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার করা হবে।

৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়ই আমরা বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সন্ধ্যাতেই খালেদ মোশাররফ, এম. জে. তাওয়াব এবং এম. এইচ. খানসহ আমরা বিচারপতি সায়েমের বাসভবনে গেলাম। সায়েম ধৈর্য সহকারে খালেদের বক্তব্য শুনলেন। এর আগে অবশ্য তাঁকে একবার বঙ্গভবনে ডেকে এনে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের কথাটি জানানো হয়েছিল। যাই হোক, সায়েম এখন খালেদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবটি পেয়ে শারীরিক অসুস্থতার কথা বলে প্রথমে অস্বীকৃতি জানালেন। আমরা কিছুটা পিড়াপিড়ি করায় বললেন, পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বিচারপতি সায়েম তক্ষুণি উঠে গিয়ে ঘরের ভেতরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই ফিরে এলেন তিনি। এতো তাড়াতাড়ি যে, আমাদের মনে হলো যেন এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি। এ সময়ের মধ্যে কার সঙ্গে কী আলাপ করলেন, তা তিনিই জানেন। তো, সায়েম এসেই বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

দুঃখের বিষয়, বিচারপতি সায়েমকে আমরা রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত করলাম, কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন তিনি। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দিলেন না আমাদের।

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে অংশ নিয়ে আমরা কোনো অপরাধ করে থাকলে বিচারপতি সায়েমের নিয়োগও একটি অপরাধ নয় কি? আমাদের বরখাস্ত করার আগে তাঁর নিজের পদত্যাগ করা উচিত ছিল না কি? বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিচারপতিদের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই যে মেরুদণ্ডহীনতার নজির স্থাপন করেছেন, বিচারপতি সায়েম তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সামরিক শাসক এরশাদের নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীর পাঠকৃত শপথবাক্যে ছিল, 'সিএমএলএ (এরশাদ) কর্তৃক যা করতে বলা হবে তাই করতে বাধ্য থাকবো'—এ ধরনের একটি বাক্য! জিয়া হত্যা মামলায় কোর্ট মার্শালের এক প্রহসনমূলক বিচারে ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের ফাঁসির আদেশ হয়। তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ফাঁসির আদেশ স্থগিত করার জন্য রিট আবেদনটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বিচারপতি সাত্তার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও এরশাদকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের। এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং বক্তৃতার মাধ্যমে তার অভিপ্রায় সম্পর্কে জানান দিয়েছিলেন। তখন তাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে পদচ্যুত এবং গ্রেফতার করা যেতো। মেরুদণ্ডহীন বিচারপতি সাত্তার তখন প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের সিভিল সমাজের চেহারা নিঃসন্দেহে উন্নততর হতো বলে আমার ধারণা। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরী সহজেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন। এর কি কোনো প্রয়োজন ছিল?

এদিকে ৫ নভেম্বর সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ রংপুর ব্রিগেড থেকে ২ ব্যাটালিয়ন এবং কুমিল্লা ব্রিগেড থেকে ১ ব্যাটালিয়ন সৈন্য ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক খালেদ মোশাররফ এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ নেন নি বলে বিষয়টি আমি জানতাম না। ৬ নভেম্বর সকালে রংপুর ব্রিগেডের সৈন্যরা ঢাকায় উপস্থিত হলে আমি বিষয়টি জানতে পারি। রংপুর ব্রিগেডের দশম বেঙ্গল এসে অবস্থান করছিল শেরে বাংলা নগরে। অন্যটির কিছু অংশ সাভারে, বাকি অংশ নগরবাড়িঘাটে। এই ব্যাটালিয়নটির কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লে. কর্নেল জাফর ইমাম। তিনি স্বউদ্যোগে ৪ নভেম্বর রাতেই আমাদের সঙ্গে বঙ্গভবনে মিলিত হন। আমার অজ্ঞাতে অতিরিক্ত সৈন্য আনার এমন ঘটনা ঘটায় আশ্চর্য হই, খটকাও লাগে। যাই হোক, কুমিল্লা থেকে যে

ব্যাটালিয়নটিকে আসতে বলা হয়েছিল তারা আর শেষ পর্যন্ত আসে নি। অজ্ঞাত কারণে কর্নেল আমজাদ তাদের পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। এদিকে ৫ নভেম্বর সকাল থেকেই যশোরের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত আলী (পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে যিনি খালেদ মোশাররফের সতীর্থ এবং শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন) অনবরত ফোন করতে থাকেন ঢাকায় আসার অনুমতি দেয়ার জন্য। এমন কি মীর শওকতের স্ত্রীও খালেদ মোশাররফের স্ত্রীকে অনুরোধ করেন খালেদকে এ ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য। এ বিষয়টি এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করছি এজন্য যে, গত পাঁচ বছরে টেলিভিশনে ৭ নভেম্বর উপলক্ষে প্রচারিত অনুষ্ঠানে প্রতিবার মীর শওকত তার ঢাকায় আসার একটি মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, যা অনেককে বিভ্রান্ত করে থাকতে পারে। মীর শওকত বলেছেন, তাকে ঢাকায় আসতে বাধ্য করা হয়। তাকে নাকি আনুগত্য প্রকাশের জন্য হুমকি দেয়া হয় এবং এর অন্যথা হলে যশোর ক্যান্টনমেন্টে বিমান হামলার ভয় দেখানো হয়। প্রকৃতপক্ষে একথা ডাহা মিথ্যে এবং এসবের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। কেননা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো মোশতাক-রশিদ-ফারুক চক্র, মীর শওকত নয়। ঐ সময়ের বাস্তবতায় মীর শওকতের গুরুত্ব ছিল খুবই সামান্য।

খালেদ মোশাররফ মীর শওকতের উপর্যুপরি টেলিফোনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে খালেদ তাকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেন। মীর শওকত ৬ নভেম্বর বিমানযোগে ঢাকায় আসেন। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে তার দীর্ঘ ২/৩ ঘন্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়। আমার ধারণা, বৈঠকে তারা বোধহয় জিয়ার ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করে থাকবেন। আমার এটাও মনে হয়, পরবর্তীকালে খালেদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে একটি বড়ো ভূমিকা ছিল ঐ রুদ্ধদ্বার বৈঠকের। আমার ধারণা একেবারে কল্পনাপ্রসূত নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ৩ নভেম্বরের ঘটনায় জড়িত আটক অফিসারদের পরিদর্শনের জন্য মীর শওকত ৭ নভেম্বরের পর গণভবনে যান। ঐ অফিসারদের সেখানে বিচারের অপেক্ষায় কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল। অথচ অফিসারদের লক্ষ্য করে তাদের সামনেই মীর শওকত গার্ড কমান্ডারের কাছে মন্তব্য করেন, 'Why try them? Line them up and shoot them like dogs.' আটক সব অফিসার মীর শওকতের এই চরম প্রতিহিংসামূলক মন্তব্যে হতবাক হয়ে যান।

৬ নভেম্বর দুপুরে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি সায়েমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হলো। দুপুর থেকেই বঙ্গভবন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি জায়গা থেকে ট্যাঙ্কগুলো ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আনা শুরু হলো। সন্ধ্যার মধ্যে প্রায় সব ট্যাঙ্ক তাদের ইউনিট লাইনে চলে আসে। গোলন্দাজ রেজিমেন্টের কামানগুলো লাইনে ফেরত এসেছিল ৪ নভেম্বরেই।

অভ্যুত্থানের চতুর্থ দিন : 'সিপাহি বিপ্লব' ও ঠাণ্ডা মাথায় খালেদকে হত্যা

৬ নভেম্বর বিকেলে খবর পেলাম ক্যান্টনমেন্টে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি সংগঠনের উস্কানিমূলক লিফলেট ছড়ানো হয়েছে। এ ধরনের কোনো সংগঠনের অস্তিত্বের কথা সেদিনই প্রথম জানি আমরা। আগে কখনো এ সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমাদের সরবরাহ করা হয় নি। এটা সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা বা তারা সেটা গোপন রেখেছিল। যাই হোক, শুনলাম, ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। অফিসারদের বিরুদ্ধে কথাবার্তা চলছে তাদের মধ্যে। সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফ সৈনিকদের উত্তেজনা প্রশমিত করতে সন্ধ্যার দিকে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে গেলেন। আমিও ছিলাম তাঁর সঙ্গে। সৈনিকদেরকে তিনি ধৈর্যশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন।

ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট থেকে ফিরে সেনাসদরে বৈঠক করলেন খালেদ। সৈনিকদের সমস্ত অস্ত্র অস্ত্রাগারে জমা করার নির্দেশ দিলেন তিনি। বললেন, পরদিন থেকে সৈনিকদের স্বাভাবিক ট্রেনিং শুরু হবে। সবদিক থেকে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিলেন তিনি। ঐ বৈঠকের পরপরই আমি সেনাপ্রধানের নির্দেশ অনুযায়ী ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে গিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলাম।

রাত দশটার দিকে খালেদ মোশাররফের ফোন পেলাম। ফোনে তিনি আমাকে বঙ্গভবনে যেতে বললেন। বঙ্গভবনে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠছি, তখন ব্রিগেড মেজর হাফিজ আমাকে বললো, "স্যার একটা জরুরি কথা আছে।" হাফিজ জানালো, প্রথম বেঙ্গলের একজন প্রবীণ জেসিও বলেছে, ঐদিন রাত বারোটায় সিপাইরা বিদ্রোহ করবে। জাসদ এবং সৈনিক সংস্থার আহ্বানেই তারা এটা করবে। খালেদ ও আমাকে মেরে ফেলার নির্দেশও সৈনিকদের দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে জেসিওটি। ঐ জেসিও, যিনি একজন সুবেদার ছিলেন, বলেছেন, আমাদেরকে এ কথা জানিয়ে সতর্ক করে দিতে।

এগারোটার দিকে আমি বঙ্গভবনে পৌছুলাম। দুই বাহিনী (বিমান ও নৌ) প্রধানকে সেখানে দেখলাম। খালেদ তখনো আসেন নি। তিনি এলেন ২০/২৫ মিনিট পর। শুনলাম, একটি দৈনিকের সম্পাদক তার বাড়িতে যাওয়ায় আটকে পড়েছিলেন খালেদ। পরে জেনেছি, ৩ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত দু'জন বিশিষ্ট সম্পাদক (একসময় যাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল) প্রায়শই খালেদ মোশাররফের বাড়িতে যেতেন এবং পরামর্শের নামে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করতেন। ৬ নভেম্বর রাতেও আমরা যখন বঙ্গভবনে অপেক্ষা করছি, এই দুই সম্পাদকের একজন তখন তার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, ৭ নভেম্বরের পর ঐ দুই সম্পাদকের কাগজেই খালেদ ও তার সহকর্মীদের 'রুশ ভারতের দালাল' বলে

চিহ্নিত করে অশালীনভাবে বিষোদ্‌গার করা হতে থাকে।

যাই হোক, খালেদ আমাকে ডেকেছিলেন একটা মধ্যস্থতার জন্য। সামরিক আইন প্রশাসকদের বিন্যাস কীভাবে হবে, তা নিয়ে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সঙ্গে তাঁর মতভেদ দেখা দিয়েছিল। উল্লেখ্য, ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরপরই মোশতাক সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজে চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হন। সেই সঙ্গে স্থগিত করেন সংবিধানের কার্যকারিতা।

তো, খালেদ বলছিলেন যে সিএমএলএ বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়া উচিত সেনাপ্রধানেরই। কারণ সশস্ত্র বাহিনী কিছু করলে তার দায়দায়িত্ব সেনাপ্রধানের ওপরই বর্তায়। অন্য দুই প্রধানের দাবিমতো প্রেসিডেন্ট সিএমএলএ এবং তিনজন (সেনা, বিমান ও নৌ-প্রধান) ডিসিএমএলএ হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। অন্য দুই প্রধান সেনাপ্রধানের অভিমতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সেনাপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নে নাজুক অবস্থায় পড়বেন, এ ভাবনাও হয়তো খালেদের মধ্যে ছিল। কথাবার্তার এক পর্যায়ে খালেদকে আমি ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতির কথা বললাম। আমাদের যে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাও জানালাম। তিনি বিশেষ গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। আমাদের কথাবার্তার মাঝপথেই বারোটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফোন এলো। ফোনে বলা হলো, সিপাইদের 'বিপ্লব' শুরু হয়ে গেছে। তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে। এ কথা শোনার পর খালেদ মিটিং ভেঙে দিলেন। খালেদের সঙ্গে বঙ্গভবনে এসেছিলেন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল হুদা ও চট্টগ্রামের একটি ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লে. কর্নেল হায়দার। হায়দার খুব সম্ভবত ছুটিতে ছিলেন এবং ঘটনাচক্রেই খালেদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর।

মিটিং ভেঙে দিয়ে হুদা ও হায়দারকে নিয়ে চলে গেলেন খালেদ মোশাররফ। অন্য দুই চিফও চলে গেলেন। তবে খালেদ আমাকে বললেন বঙ্গভবনেই থাকতে। তিনি নিজে প্রথমে যান মোহাম্মদপুরে কোনো এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে তাঁরা যান রংপুর ব্রিগেড থেকে আসা দশম বেঙ্গলের অবস্থানস্থল শেরেবাংলা নগরে।

রাত বারোটার পর সিপাইরা ফিল্ড রেজিমেন্টের মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করে ফিল্ড রেজিমেন্টে নিয়ে আসে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই মেজর মহিউদ্দিনই ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য একটি আর্টিলারি গান থেকে ৩২ নম্বরের বাড়িতে গোলা ছুঁড়েছিল।

শেষ রাতের দিকে দশম বেঙ্গলের অবস্থানে যান খালেদ। পরদিন সকালে ঐ ব্যাটালিয়নে নাশতাও করেন তিনি। বেলা এগারোটার দিকে এলো সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটি। ফিল্ড রেজিমেন্টে অবস্থানরত কোনো একজন অফিসারের

নির্দেশে দশম বেঙ্গলের কয়েকজন অফিসার অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খালেদ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় নি আজো। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার হলে ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত বারোটার পর ফিল্ড রেজিমেন্টে সদ্যমুক্ত জিয়ার আশপাশে অবস্থানরত অফিসারদের অনেকেই অভিযুক্ত হবেন এ দেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম সেনানায়ক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফকে হত্যার দায়ে। তথাকথিত সিপাহি বিপ্লবের অন্যতম নায়ক কর্নেল তাহের এবং তৎকালীন জাসদ নেতৃবৃন্দও এর দায় এড়াতে পারবেন না।

সাতই নভেম্বর : "অফিসারদের রক্ত চাই"

আগেই বলেছি ৬ নভেম্বর রাতে খালেদ মোশাররফ চলে যাওয়ার পরও আমি বঙ্গভবনে থেকে যাই তাঁরই নির্দেশে। খালেদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় নি আমার। তারপর তো 'সিপাহি বিপ্লব' ঘটে গেলো। রাত তিনটার দিকে জিয়া ফোন করলেন আমাকে। বললেন, "Forgive and forget, let's unite the Army." আমি রূঢ়ভাবেই বলি, "আপনি সৈনিকদের দিয়ে বিদ্রোহ করিয়ে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। আপনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন, আর নামতে পারবেন না। যা করার আপনি অফিসারদের নিয়ে করতে পারতেন, সৈনিকদের নিয়ে কেন?" সেনাবাহিনীর মধ্যে হিংসা ও বিভেদের রাজনীতি ঢোকানো হয়েছে বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করি আমি।

এই সময় একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে। জিয়ার সঙ্গে আমার কথোপকথন হচ্ছিল ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে। আমাদের সংলাপের যে অংশগুলো বাংলা ছিল তা সঙ্গে সঙ্গে লাইনে থাকা অন্য কেউ ইংরেজিতে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল, যেটা আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্গভবনে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এমন কেউ অবস্থান করছিল যে আমাদের সংলাপ বিদেশি কোনো সূত্রের কাছে ভাষান্তর করে দিচ্ছিল। আমাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কতো নাজুক এর থেকেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। খোদ বঙ্গভবনের ভেতরে অবস্থান করেই কেউ সে কাজটা করছিল।

রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ বঙ্গভবনের অদূরে 'নারায়ে তাকবির,' 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' স্লোগান শুনলাম। সেই সঙ্গে ফাঁকা গুলির আওয়াজ। দ্বিতীয় বেঙ্গলের দু'টি পদাতিক কোম্পানি তখন বঙ্গভবনের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিল। এছাড়া ছিল রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত পদাতিক ব্যাটালিয়নটির একটি কোম্পানি। এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল ক্যাপ্টেন দীপক। কোম্পানি কমান্ডারদের নির্দেশ দিলাম পজিশন নিতে এবং বিদ্রোহী সৈনিক সংস্থার সদস্যরা গুলি করলে তাদের প্রতিরোধ করতে। ১৫/২০ মিনিট পর গুলি ও স্লোগান আরো তীব্র এবং নিকটতর হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য হয়ে গেলাম যাদেরকে প্রতিরোধের জন্য পাঠিয়েছি তারা পাল্টা গুলি করছে না দেখে। তখন আমার বোধোদয় হলো, বিদ্রোহী সিপাইদের ঐ স্লোগানে তারাও immobilized হয়ে গেছে। তারা ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করবে না। এ ঘটনা দেখার পর আমার সঙ্গে থাকা অন্য একজন কোম্পানি কমান্ডার ক্যাপ্টেন দিদার আমাকে বললো, "স্যার, চলুন আমরা বেরিয়ে গিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করি।"

ওদিকে ফায়ারিং ও স্লোগান তখন একেবারে সামনে এসে গেলো। উপায়ান্তর না দেখে দিদার ও কয়েকজন সৈনিককে নিয়ে আমি বঙ্গভবনের পেছনের পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ সময় আমার পা ভেঙে যায়। যাই হোক, বাইরে থাকা একটি সামরিক ডজ গাড়িতে উঠলাম সবাই। এই অবস্থায় ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া সমীচীন মনে হলো না। আমার তখন জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। ভেবে দেখলাম কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এখনো শান্ত। তাই সেই অভিমুখেই রওনা হলাম। সেখানে গিয়ে সিএমএইচ-এ চিকিৎসা নেয়া যাবে। মেঘনা ফেরিঘাটে পৌঁছে মনে হলো কুমিল্লা যাওয়াটাও ঠিক হবে না। এতোক্ষণে সেখানকার পরিস্থিতিও হয়তো পাল্টে গেছে। সঙ্গী সৈনিকদের ফেরত পাঠিয়ে আমি ও দিদার নৌকায় করে মুন্সিগঞ্জ অভিমুখে রওনা হলাম। উল্লেখ্য, মেঘনা ফেরিঘাটে কর্মরত বিআইডব্লুটিসির কর্মচারীদের কাছ থেকে আমরা সাধারণ শার্ট আর লুঙ্গি নিয়ে ইউনিফরম ছেড়ে সেগুলো পরে নিই।

নৌকায় ঘণ্টা দুয়েক চলার পর দেখলাম মুন্সিগঞ্জের এসডিও একটা লঞ্চ নিয়ে নারায়ণগঞ্জে যাচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে আমার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বললাম। ক্যাপ্টেন দিদারের পরিচয় গোপন করে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমাকে সাহায্য করা এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র হিসেবে। এসডিও আমাকে সঙ্গে করে নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে পুলিশি হেফাজতে রাখা হলো আমাকে। আর দিদার জনতার সাথে মিশে গেলো।

নারায়ণগঞ্জ থানা থেকে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জিয়ার পক্ষে মীর শওকত আমাকে বললেন, "তুমি ওখানেই থাকো। আমি লে. কর্নেল আমিনুল হককে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে নিয়ে আসবে।"

ঘণ্টা দুয়েক পর আমিনুল হক এলো। তার সঙ্গে ২/৩টি গাড়িতে চতুর্থ বেঙ্গলের কিছু সৈন্য। ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম আমরা। ঢাকা পৌঁছে আমাকে সিএমএইচ-এ ভর্তি করা হলো। এখানে এসেই শুনি খালেদ, হায়দার ও হুদার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর। পরে শুনি মুক্তি পেয়ে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্টে আসার পর জিয়া নিজে বলেছিলেন, "There should be no bloodshed. No retribution. Nobody will be punished without

proper trial." অথচ জিয়ার নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং যাবতীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয় সেনাবাহিনী তথা মুক্তিযুদ্ধের তিন বীর সেনানিকে।

হঠকারিতার চরম মূল্য

বিদ্রোহের পরিধি ক্রমশ বিভিন্ন ইউনিট-সাব ইউনিট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। নিরাপত্তাহীনতার কারণে বহু অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন। আমাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে কোনো যোগ না থাকা সত্ত্বেও একজন লেডি ডাক্তারসহ ১৩ জন অফিসারকে তথাকথিত বিপ্লবী সৈনিকেরা গুলি করে হত্যা করে। বীর মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরীর স্ত্রীকেও তারা হত্যা করে। জিয়াও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। ক্রমশ তিনি ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে কথিত ভারতীয় জুজুর ভয় দেখিয়ে সিপাহিদের নিয়ন্ত্রণে আনলেন। উল্লেখ্য, তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহে অংশ নেয়া এই সব সিপাহির বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান-প্রত্যাগত।

মাসখানেক হাসপাতালে থাকার পর ৭ ডিসেম্বর রিলিজ করা হলো আমাকে। তারপর পাঠানো হলো ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রোটেক্টিভ কাস্টডিতে। জেলে থাকাকালে জিয়া ও তাঁর সহযোগীরা আমার বিরুদ্ধে ৭টি চার্জ তৈরি করেন, যার ৪টিই ছিল মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হলো। তদন্ত আদালতের প্রেসিডেন্ট জেলেই আমার উপস্থিতিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। বর্তমান মন্ত্রী লে. জেনারেল (অব.) নুরুদ্দিন খানসহ অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আসেন। তাদের মধ্যে তৎকালীন দ্বিতীয় বেঙ্গলের সিও-কে দেখে খুবই অবাক হলাম। প্রধান আসামি হিসেবে আমার পরই তার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল। তিনি রাজসাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে রক্ষা করেন এবং চাকরি বজায় রাখেন। মামলা অবশ্য বেশি দূর এগোয় নি।

এ সময় আরো ১২ জন সেনা অফিসার তৎকালীন গণভবনে বন্দি ছিলেন। এই মুহূর্তে যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন : কর্নেল মালেক (পরে এমপি ও মেয়র), লে. কর্নেল গাফফার (পরে এমপি ও মন্ত্রী), লে. কর্নেল জাফর ইমাম (পরে এমপি ও মন্ত্রী), মেজর আমিন, মেজর হাফিজ (পরে এমপি ও মন্ত্রী), মেজর ইকবাল (পরে এমপি ও মন্ত্রী), ক্যাপ্টেন কবির ; ক্যাপ্টেন তাজ (পরে এমপি), ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ, ক্যাপ্টেন নাসির, ক্যাপ্টেন দীপক প্রমুখ। তিনজন অফিসার দেশত্যাগ করেন। এরা হলেন ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান (পরে রাষ্ট্রদূত, প্রয়াত), ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর ওসমান (পরে এমপি) ও লেফটেন্যান্ট কাদের। এছাড়া এয়ারফোর্সের ১২/১৩ জন অফিসারকে আটক রাখা হয়েছিল বিমানবাহিনী এলাকায়। তাওয়াবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে

চটজলদি তাদের বিচার শেষ করা হয়। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকতকে মৃত্যুদণ্ড এবং অন্যাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরে লিয়াকতের সাজা কমিয়ে দেয়া হয় ১৪ বছরের জেল।

এদিকে গণভবনে আটক সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে চারজন— মেজর হাফিজ, মেজর ইকবাল, ক্যাপ্টেন তাজ ও ক্যাপ্টেন হাফিজউল্লাহ এক পর্যায়ে পালিয়ে যায়। পালিয়ে গিয়ে তারা আশ্রয় নেয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত প্রথম বেঙ্গলে, যাদের নিয়ে আমরা অভ্যুত্থান শুরু করেছিলাম। প্রথম বেঙ্গলকে ৭ নভেম্বরের পর জিয়া শাস্তিস্বরূপ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পালিয়ে যাওয়া চারজন অফিসারকে আশ্রয়দানকারী প্রথম বেঙ্গলের বক্তব্য ছিল, ঐ অফিসাররা কোনো অপরাধ করে নি। তাদের যদি কোনো বিচার করতে হয় তবে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীদের বিচার আগে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই প্রথম বেঙ্গলকে এ অবস্থান থেকে টলানো গেলো না। চারজন অফিসারকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত সৈনিকদের কাছ থেকে সরিয়ে আনার জন্য পর্যায়ক্রমে হেলিকপ্টারে করে নেগোসিয়েশন টিম, সিজিএস মেজর জেনারেল মঞ্জুর, এমন কি সেনাপ্রধান জিয়া একাধিকবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া গেলেন। পালিয়ে যাওয়া চার অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করলেন সিনিয়র অফিসাররা। কিন্তু তারা নিজেদের অবস্থানে অটল থাকলো। অপরদিকে তাদের ওপর উর্ধ্বতন সেনা কর্তৃপক্ষের চাপও অব্যাহত থাকে। ১৯৭৬ সালের মার্চের প্রথমদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেনাদল ঢাকা অভিযানের চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করে। এতে সেনাপ্রধান জিয়া ও তাঁর সহকর্মীদের টনক নড়ে ওঠে। তারা তড়িঘড়ি এক আপস ফর্মুলা দিলেন। বলা হলো, আটক সব সেনা অফিসারকে ছেড়ে দেয়া হবে। তবে আর্মিতে না রেখে বেশির ভাগ অফিসারকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কেবল দৃষ্টান্ত হিসেবে একজন অফিসার— ৪৬তম ব্রিগেড কমান্ডার (অর্থাৎ আমার) বিচার করা হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত অফিসার ও সৈনিকেরা সেটা মানতে রাজি হলো না। তারা দাবি করলো, কোনো অফিসারের বিচার করা যাবে না এবং তাদেরকে চাকরিতে রাখতে হবে। বিক্ষুব্ধ সৈনিকরা সত্যি সত্যিই ঢাকা আসার উদ্যোগ নিলে জিয়া আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া যান এবং আশ্বস্ত করেন, কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এবার তিনি ঐ চারজন অফিসারকে নিজে সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তবে এতো কিছুর পর ঐ চারজন অফিসার নিজেরাই আর সেনাবাহিনীতে থাকা সমীচীন মনে করে নি। অফিসার বা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কেউই আর তার জন্য চাপাচাপিও করে নি। তবে জিয়া প্রতিশ্রুতি দেন তাদেরকে কূটনৈতিক নিয়োগ দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেন নি। যদিও জিয়াই ১৫ আগস্টের হত্যাকারীদের বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন।

১৯৭৬ সালের ৭ মার্চ ছাড়া পেলাম আমি। তৎকালীন ডিএমআই লে. কর্নেল মোহসীন (পরে ব্রিগেডিয়ার এবং ফাঁসিতে নিহত) আমাকে সেন্ট্রাল জেল থেকে বাসায় পৌঁছে দিলেন। সেই সঙ্গে আমার হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো বরখাস্তের আদেশ। আমার চাকরিচ্যুতির ফাইলে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েম।

৭ নভেম্বরের 'সিপাহি বিপ্লব' সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আসলে এতে অংশ নেয়া সৈনিকদের বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তান প্রত্যাগত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বেঙ্গল রেজিমেন্টের কোনো একটি ব্যাটালিয়নও এর মধ্যে ছিল না। বিদ্রোহী সৈনিকদের স্লোগানে প্রভাবিত হয়ে তারা হয়তো আমাদের সুরক্ষা দেয় নি, কিন্তু স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে তারা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করেও নি।

অন্যদিকে আর্মির ট্রাডিশন ও চেইন অফ কমান্ড ভেঙে ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহের যে অপরাধ করেছিলেন, তার জন্য তিনি বিচারের সম্মুখীনও হয়েছিলেন। বিভিন্ন র‍্যাঙ্কের মধ্যে আনুগত্যের যে বিধি ও ঐতিহ্য ছিল, তাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করেছিলেন কর্নেল তাহের। শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং আনুগত্যের ভিতে ধস নামিয়েছিলেন তাহের ও জাসদের উদ্ভাবিত হঠকারী, আত্মঘাতী বিভিন্ন স্লোগান। আসলে, তাহের এবং তৎকালীন জাসদ নেতৃবৃন্দ জিয়াকে সামনে রেখে, জিয়ার মুক্তিযুদ্ধকালীন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে সুচতুরভাবে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস নেন ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। কিন্তু এতো কিছুর পরও চেইন অফ কমান্ড এবং সেনাপ্রধান পদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও আনুগত্যের কাছে তারা পরাজিত হন। আর তাহেরকে এর জন্য চরম মূল্যও দিতে হয়।

যেদিন রাতে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয়, সেদিন সন্ধ্যায় তাহেরের প্রধান কৌঁসুলি সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল প্রয়াত আমিনুল হক (যিনি আমার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) আমাকে তার চেম্বারে নিয়ে যান। সেখানে উপস্থিত তাহেরের নিকটাত্মীয়রা তাহেরের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। কোনোভাবে প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য আমি অত্যন্ত প্রভাবশালী তিন-চারজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হই।

বিপ্লব কোথায় এবং কিভাবে হলো

৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান ছিল প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ড এবং অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে একটি সশস্ত্র প্রতিবাদ। চারটি লক্ষ্যের মধ্যে দুটিতে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলাম আমরা – অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী বিদ্রোহীদের বলপূর্বক অপসারণ করা হয় এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোকে চেইন অফ কমান্ডে ফিরিয়ে আনা হয় আমাদের উল্লিখিত

প্রয়াসের ভেতর দিয়ে। খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি ঘটনার নিয়ন্ত্রকরূপে আমাদের ক্ষমতার ক্ষণস্থায়িত্বের কারণে। জনগণই বিচার করবেন, আমার বক্তব্যের আলোকে, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান একটি দেশপ্রেমিক পদক্ষেপ ছিল কি না?

আমরা দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হয়েছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডের পরিণতিতে। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি কোনো পাল্টা অভ্যুত্থান ছিল না। মোশতাক-রশিদ-ফারুক চক্র এই পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় নি এবং সে জন্য তারা ক্ষমতায়ও ফিরে আসতে পারে নি।

জিয়ার ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে জাসদ ও কর্নেল তাহেরই ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালায় ৭ নভেম্বর। সেই দিনের অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টায় তাদের কোনো বিপ্লবী রাজনীতি সম্পৃক্ত ছিল না। 'সৈনিক সংস্থার' ১২ দফায় বাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করে এমন একটি দফাও স্থান পায় নি। সবগুলোই ছিল সেনাছাউনিকেন্দ্রিক। সেনাছাউনিতে শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে রচিত ১২-দফায় ছিল শুধু ঘৃণা, হিংসা আর বিদ্বেষ।

অফিসারদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ উস্কে দিয়ে, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, অফিসার নিধনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তারা সৈনিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণে এনে ক্ষমতা নিজেদের দখলে নেয়ার প্রয়াস চালিয়েছিল সেদিন। মাত্র ১২ ঘন্টার ব্যবধানে জিয়া এবং তার অনুগতরা জাসদ ও তাহেরের ঐ অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। জাসদ তাদের লক্ষ্য অর্জনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। কিন্তু জাসদ এবং তাহেরের হঠকারিতায় এরই মধ্যে নিহত হন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সেনানিদের কয়েকজন।

মূলত চেইন অফ কমান্ড ও জিয়ার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি তাকে সেদিন সফল হতে সাহায্য করে। তাহের ও তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরা ব্যর্থ হন।

৭ নভেম্বরের ঘটনাবলিতে জাসদ যতো বিপ্লবী তত্ত্বই পরে জুড়ে দিতে চেষ্টা করুক না কেন, বস্তুত এটি ছিল রাজনীতি-বর্জিত ক্ষমতা দখলের একটা নির্জলা প্রয়াসমাত্র। এর সঙ্গে সেদিন কোনো বিপ্লবী কর্মকাণ্ড অথবা তত্ত্ব জড়িত ছিল না। তথাকথিত 'শ্রেণী সংগ্রামের' তত্ত্বের আবরণে ক্ষমতা দখলের এক হীন চক্রান্ত হয়েছিল এ দিনটিতে।

৭ নভেম্বর এবং এর অব্যবহিত কয়েকদিনের মধ্যে জিয়া তার একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এদিকে তাহের ও তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীরা আত্মগোপন করার মাধ্যমে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একপক্ষকালের মধ্যে জাসদের উল্লেখযোগ্য নেতারা অন্তরীণ হন।

জিয়া ক্ষমতা নিয়ে আমাদেরই নিযুক্ত প্রেসিডেন্টকে দায়িত্বে বহাল রাখেন। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধানদ্বয়ও (যারা খালেদের সঙ্গে সামরিক আইন প্রশাসনে ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে দর কষাকষি করেছিলেন) স্বপদে বহাল

রইলেন। মোশতাক অপসারিত এবং ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তথাকথিত সূর্যসন্তানেরা দেশ থেকে বহিষ্কৃত হলো। দৃশ্যপটে একমাত্র কেবল খালেদ মোশাররফ রইলেন না। বাংলাদেশের কোনো শহর-বন্দরে বিপ্লবের কোনো আলামতও পরিলক্ষিত হলো না। তাহলে 'বিপ্লব' কোথায় এবং কিভাবে ঘটলো?

আমার ধারণা, ৭ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড তদন্ত ও বিচারের হাত থেকে চিরদিনের জন্য দায়মুক্ত থাকার ব্যবস্থা হিসেবে অত্যন্ত সুচতুরভাবেই এই দিনটিকে 'জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস' রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে জিয়ার একটি মানবতা-বিরোধী পদক্ষেপ। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন ছিল। সেই সঙ্গে সামরিক ও বেসামরিক সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের বিধান করা প্রয়োজন।

যে সৎ উদ্দেশ্য ও মহৎ লক্ষ্য নিয়ে আমরা ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলাম, বিবিধ কারণে প্রাথমিক বিজয়ের পর সে ক্ষেত্রে সাফল্য সংহত করতে পারি নি। সেই সকল কারণ বিবৃত করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। কোনো অজুহাতও দাঁড় করাবো না। আমরা যে ব্যর্থ হয়েছি, এটাই সত্য। আর সেই ব্যর্থতার দায়ভার সম্পূর্ণ এবং এককভাবে আমারই প্রাপ্য।

জীবন এবং চাকরির ঝুঁকি নিয়ে সেদিনের উদ্যোগে যারা আমার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন, বিশেষভাবে আমার স্টাফ অফিসারবৃন্দ এবং বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে যাওয়া সেই চারজন অফিসার, যে আনুগত্য, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছিলেন, তাদের অবদান আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। সেদিনকার ঘটনাপ্রবাহে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের প্রতিও রইলো আমার আন্তরিক সমবেদনা। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম বেঙ্গলের সুবেদার মেজর, অনারারি লে. আবদুল মজিদের সময়োচিত সহযোগিতার কথা স্মরণ করি শ্রদ্ধার সঙ্গে।